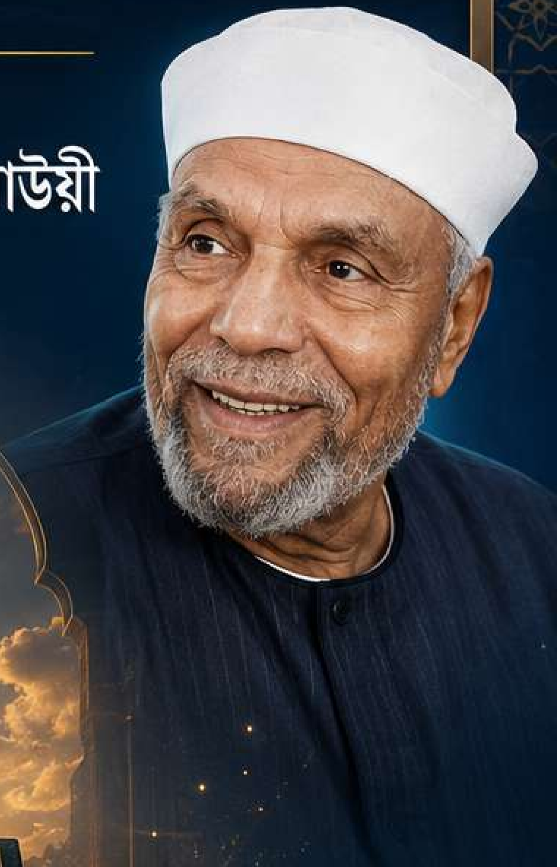
চ্যালেঞ্জ অব দ্য
হলি কুরআন



শায়েখ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লি আশ- শারাউয়ী

বিশ্ববিখ্যাত ইসলামিক স্কলার , মিশর

قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتُ
الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ
أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا
(الإسراء: 88)

কুরআনের অলৌকিকতা, বৈশিষ্ট্য ও চিরন্তন চ্যালেঞ্জ



অনুবাদ- সম্পাদনা

ইসমাইল জাবীহুল্লাহ আজহারী

চ্যালেঞ্জ অব দ্য হলি কুরআন

শায়েখ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লি আশ- শারাউয়ী
বিশ্ববিখ্যাত ইসলামিক স্কলার ও মুফাসসির, মিশর

অনুবাদ ও সম্পাদনা
ইসমাইল জাবীহুল্লাহ আজহারী

সূচীপত্র

অনুবাদক-সম্পাদকের কথা

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ!!
সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!! যদি কেউ আরব বিশ্বের অত্যাধিক সমাদৃত ও বিখ্যাত স্কলারদের নাম গণনা করা শুরু করেন তাহলে লিস্টের প্রথম দিকে যার নাম চলে আসবে তিনি হচ্ছেন- মিশরের বিশ্ববিখ্যাত ইসলামিক স্কলার ও মুফাসসির শায়েখ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লী আশ-শারাউয়ী (রহ.)। মিশরের দল মত নির্বিশেষে সকল মুসলিম যার আলোচনার পাগল এবং সশ্রদ্ধে যাকে সবাই উস্তাজের কাতারে স্থান দিয়েছেন তিনি হচ্ছেন- শায়েখ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লী আশ-শারাউয়ী (রহ.)। সমগ্র আরব বিশ্বেই তিনি সমাদৃত!!

আপনি যদি তার যেকোন আলোচনা পড়েন কিংবা শুনেন মনে হবে যেন, তার কাছ থেকে নিঃসৃত প্রতিটি শব্দ থেকে যেন মণিমুক্তা ঝরছে। সেসব মণিমুক্তা যে যত বেশি কুড়িয়ে নিতে পারবে সে তত বেশী জ্ঞান নামক অত্যন্ত দামী সম্পদের মালিক হয়ে সম্পদশালীদের খাতায় নাম লেখাতে পারবে।

তার লেখা না পড়লে আপনি ধারণাও করতে পারবেন না যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কি পরিমাণ মেধা দিয়েছেন? তার লেখা পড়লে দেখবেন- তার লেখার মধ্যে কুরআন-হাদীসের তথ্য যেমন আছে তেমনি আছে- প্রচুর পরিমাণে ভাষা শৈলী, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক তথ্য। শুধু এতটুকুই নয় বরং তাতে অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন তথ্যও এসে থাকে প্রচুর পরিমাণে। এগুলোতে তিনি শুধুমাত্র রেফারেন্স দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং, তিনি সেগুলোর সাথে যুক্তির সংমিশ্রণে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে অন্যদেরকে যুক্তি দিয়ে বুঝানোর যে প্রখর যোগ্যতা দান করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তার প্রতিটি আলোচনা পাঠকের ব্রেনকে নাড়িয়ে দেয়। চিন্তার খোরাক যোগায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শায়েখকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসেবে কবুল করে নিন এটাই কামনা। আমীন।

ইসমাইল জাবীহুল্লাহ আজহারী
হেলসিংকি, ফিনল্যান্ড
২১.০৭.২০২৬ ইং
যোগাযোগ- ismailakbbd@gmail.com

ভূমিকা

পবিত্র কুরআন নিজেই একটা মুজিজা তথা অতি অলৌকিক জিনিস। এর একটা আজীব বৈশিষ্ট্য হল- এটা চিরকাল অলৌকিক হয়েই থাকবে এবং এটার এমন বৈশিষ্ট্য কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। কুরআন আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যকার সর্বশেষ কিতাব। এর অলৌকিকত্বের জন্য কোনো নির্দিষ্ট যুগ নেই। মানবজাতির দিকনির্দেশনার জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। এটি কোনো বিজ্ঞানের বই হিসেবে আসেনি—এ সত্যটি আমাদের মাথায় রাখা উচিত। কিন্তু একই সাথে, এটি একটি চিরন্তন ও স্থায়ী অলৌকিকত্ব হিসেবে এসেছে। আর এই কারণেই এর মধ্যে সমস্ত যুগের জন্য অলৌকিকত্ব রয়েছে; যারা আমাদের পূর্বে বেঁচে ছিলেন তাদের জন্য, আমাদের এই বর্তমান যুগের জন্য এবং যারা আমাদের পরে আসবে তাদের জন্য—যতক্ষণ না এই পৃথিবী এবং এর মধ্যকার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়।

কুরআন এসেছে জীবিতদের সতর্ক করার জন্য। তাই এটি জীবিত মানুষদের উদ্দেশ্য করেই অবতীর্ণ। এর চ্যালেঞ্জ কেবল এই পৃথিবীতে বসবাসকারীদের জন্য, যারা এই পৃথিবী ছেড়ে পরকালে চলে গেছেন তাদের জন্য নয়। কারণ তারা তো এখন 'আইনুল ইয়াকীন' (চোখে দেখে নিশ্চিত বিশ্বাস) প্রত্যক্ষ করছেন এবং দুনিয়া ত্যাগ করার পর সত্যকে চিনে গেছেন।

যখন ওয়াকফ ও আল-আজহার বিষয়ক মন্ত্রী, শ্রদ্ধেয় শায়খ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লি আশ-শা'রাউয়ী 'আখবার আল-ইয়াউম' পত্রিকায় কুরআনের অলৌকিকত্ব নিয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলো লেখা শুরু করেন, তখন এই প্রবন্ধগুলো ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কারণ এগুলো সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কুরআনের অলৌকিকত্ব নিয়ে আলোচনা করেছে।

শ্রদ্ধেয় শায়খ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লি আশ-শা'রাউয়ী সেখানে আদম (আ.)-কে নিয়ে আলোচনা করেছেন—কীভাবে আল্লাহ তাঁকে সবকিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, আদম (আ.)-কে আল্লাহর নামসমূহ শেখানোর অর্থ কী... এরপর তিনি আলোচনা করেছেন যে, মানুষ যখন বর্তমানে কোনো কিছু শেখে, তখন তাকে প্রথমে নামগুলোই শিখতে হয়।

এরপর শ্রদ্ধেয় শায়খ শা'রায়ী আলোচনা করেছেন—কেন কুরআন পুরো মানবজাতির জন্য একটি সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব হিসেবে নাজিল হলো? যেখানে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলো কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য নাজিল হতো, সেখানে কুরআন মানবজাতির সমস্ত সমস্যার সমাধান একসাথে নিয়ে এসেছে।

এরপর তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন কীভাবে কুরআন অদৃশ্যের তিনটি পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছে: অতীতের পর্দা, বর্তমানের পর্দা এবং ভবিষ্যতের পর্দা। এমনকি এটি মানুষের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে তা প্রকাশ করে দেয় যা মানুষ লুকিয়ে রাখে, মুখে প্রকাশ করে না এবং আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

কুরআন নিকটবর্তী ও দূরবর্তী ভবিষ্যতের পর্দাও উন্মোচন করেছে। এটি এমন সব বিষয়ের পূর্বাভাস দিয়েছে যা মানুষের বুদ্ধি ভাবতেও পারত না যে ঘটবে বা ঘটা সম্ভব। এটি বিভিন্ন যুদ্ধের ফলাফল এবং জাতিসমূহের ভাগ্য নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। এটি আমাদের বলেছে যে পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবী জানার বহু আগেই এটি আমাদের ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology) সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছে।

এটি মানবজাতিকে একটি মাছি সৃষ্টি করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে এবং সর্বাতিক্ষুদ্র (الذرة) জিনিসের চেয়েও ক্ষুদ্র বস্তুর রহস্য উন্মোচন করেছে। (লক্ষণীয় যে, ‘ক্ষুদ্রতর’ শব্দটির অর্থ হলো আকারের দিক থেকে চরম সূক্ষ্মতা, কারণ ক্ষুদ্রের চেয়েও ক্ষুদ্রতর বিষয় রয়েছে)।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

"এবং যা মাটির নিচে রয়েছে।" (সূরা ত্বাহা-৬)

এটি নির্দেশ করে যে মাটির নিচে বিশাল সম্পদ লুকিয়ে রয়েছে। এরপর কুরআন আমাদের সৃষ্টির অলৌকিকত্ব এবং এটি কীভাবে সম্পন্ন হয় তা জানিয়েছে। এটি আমাদের এমন কিছু বিষয় স্পষ্ট করেছে যা আমরা জাগতিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পেরেছি এবং এমন কিছু বিষয়ও দেখিয়েছে যা আমরা আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারিনি।

এ সমস্ত বিষয় ওয়াকফ ও আল-আজহার বিষয়ক মন্ত্রী, শ্রদ্ধেয় শায়খ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লী আশ-শা'রায়ী অত্যন্ত সহজ, সুন্দর এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। সত্যি বলতে, এই বইটি কুরআনের কিছু অলৌকিকত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। এটি এমন এক তাফসীর যা এ পর্যন্ত কোনো ইমাম এভাবে আলোচনা করেননি এবং এত সহজ ও আনন্দদায়ক শৈলীতে উপস্থাপন করেননি। এটি কুরআনিক লাইব্রেরি তথা তাফসীরের ভাণ্ডারে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেছে, যা নিয়ে প্রত্যেক মুসলিম গর্ব করতে পারে।

আমি শ্রদ্ধেয় শায়খ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লী আশ-শা'রায়ী-কে বলেছিলাম যে, আমি আশা করি আপনি পুরো কুরআনের তাফসীর করবেন এবং আপনার নামে একটি তাফসীর গ্রন্থ প্রকাশিত হবে। তিনি এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি আল্লাহর কাছে কামনা করি তিনি যেন শীঘ্রই তাঁর এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন।

শ্রদ্ধেয় শায়খ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লী আশ-শা'রায়ীর লেখা এই বইটি পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত। প্রত্যেক মুসলিমের কাছে এটি পৌঁছে দিতে পেরে আমি আনন্দিত। আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা, শ্রদ্ধেয় শায়খ শা'রায়ী যেন শীঘ্রই পুরো কুরআনের তাফসীর সম্পন্ন করতে পারেন এবং আল্লাহ যেন তাঁর এই মহান কাজে বরকত দান করেন।

- আহমেদ জাইন (প্রস্তুত ও সম্পাদনাকারী)

কুরআনের অলৌকিকত্ব

হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি এমন কোনো যুদ্ধক্ষেত্রের ফলাফলের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন যা সাত বা আট বছর পর ঘটবে? তিনি কি নির্ধারণ করতে পারেন যে কে জয়ী হবে আর কে পরাজিত হবে? কোন জিনিসটি তাঁকে এমন এক অদৃশ্যের (গায়েবের) বিষয়ে জড়াতে বাধ্য করল? তিনি কাফেরদের মনের গোপন কথা কীভাবে বলে দেন—যা এমনকি তাদের ঠোঁট নড়েও বের হয়নি? কীভাবে তিনি ইসলামের শত্রুদের ভবিষ্যৎ পরিণতি জানিয়ে দেন এবং অদৃশ্যের নানা বিষয়ে কথা বলেন? যদি কুরআনের বলা প্রতিটি অক্ষর সত্য প্রমাণিত না হতো, তবে গোটা ঈমানের অস্তিত্বের কী দশা হতো? কিন্তু আসল বিষয় হলো, এর বক্তা স্বয়ং আল্লাহ এবং এর বাস্তবায়নকারীও আল্লাহ।

কুরআন হলো আল্লাহর বাণী, যা তাঁর রাসূল আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। এর তিলাওয়াত ইবাদত এবং এর মাধ্যমেই মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কুরআন একাধারে অনেক অলৌকিকত্ব বহন করে। আল্লাহ এর মাধ্যমে প্রথমে আরবদের চ্যালেঞ্জ করেছেন, তারপর সমস্ত মানব ও জিন জাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। আল্লাহ এর দ্বারা ফেরেশতাদের চ্যালেঞ্জ করেননি; কারণ ফেরেশতাদের নিজস্ব কোনো ইচ্ছা বা স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই। তারা কেবল তা-ই করেন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ পান। অতএব, কুরআন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে সেই সমস্ত শক্তিকে যাদের স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে এবং যাদের আল্লাহ বুদ্ধি, চিন্তা ও বাছাই করার ক্ষমতা দিয়ে আলাদা করেছেন।

কুরআনের অলৌকিকত্ব নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের 'মু'জিযা' বা অলৌকিকত্ব শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করা দরকার। যখন কোনো মানুষ এসে বলে যে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন রাসূল এবং তাঁর বিধান প্রচার করতে এসেছে, তখন কি আমরা তাকে অমনি বিশ্বাস করব? নাকি আমরা তার দাবির সপক্ষে প্রমাণ চাইব? তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাসূলের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য একটি করে **মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন থাকা আবশ্যক ছিল। আর সেই অলৌকিক বিষয়টি এমন হতে হতো যা অন্য কেউ করার ক্ষমতা রাখে না।**

নবীদের ‘মু'জিযা’ কেমন ছিল?

একই সাথে অলৌকিক নিদর্শনটি এমন বিষয়ের হতে হতো যাতে ওই নবীর কওম বা জাতি পারদর্শী ছিল। কেন? যাতে কেউ বলতে না পারে যে রাসূল তাঁর জাতিকে এমন একটি বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করেছেন যা তারা বোঝেই না এবং যে বিষয়ে তাদের কোনো যোগ্যতাই নেই। চ্যালেঞ্জটি এমন বিষয়েই হওয়া উচিত যাতে ওই জাতি সর্বোচ্চ পারদর্শিতা অর্জন করেছে, তবেই তো চ্যালেঞ্জের একটি মূল্য থাকে। এই কারণে আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে, প্রত্যেক রাসূলের মু'জিযা এসেছে সেই বিষয়ে যা তাঁর জাতি খুব ভালো পারত এবং তা এসেছে তাদের সেই মেকি উপাস্যদের ভিত্তি ভেঙে দেওয়ার জন্য যাদের তারা আল্লাহর পরিবর্তে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছিল।

যেমন ধরুন, ইব্রাহিম (আ.)-এর মু'জিযা এসেছিল এমন এক জাতির কাছে যারা মূর্তিপূজা করত, মূর্তির সামনে সিজদা করত এবং সেগুলোকে পবিত্র মনে করত। এ কারণে তারা যখন ইব্রাহিম (আ.)-কে পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিল, তখন তারা তাদের মূর্তিদের সামনে এনে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করল। স্বাভাবিকভাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, এই মূর্তিরা তাদের ভাঙচুরকারীর ওপর প্রতিশোধ নেবে—যদি নিজেদের লাভ-ক্ষতি করার ন্যূনতম ক্ষমতাও তাদের থাকত। কিন্তু তারা যখন ইব্রাহিম (আ.)-কে (যিনি তাদের বিশ্বাসকে বোকা বলেছিলেন) আগুনে ফেলে দিল, আগুন তাঁকে পোড়াতে পারল না এবং তাদের দেবতারা তাদের হতাশ করল।

অবশ্য আগুন বেছে নেওয়ার আরেকটি অর্থও হতে পারে। অতীতে কত মানুষ আগুনের পূজা করেছে! এমনকি বর্তমান সময়েও কিছু মানুষ আগুনকে পবিত্র উপাস্য মনে করে। তবে ইব্রাহিম (আ.)-এর মু'জিযা কেবল আগুন থেকে বেঁচে যাওয়া নয়; আল্লাহ যদি শুধু তাঁকে বাঁচাতে চাইতেন, তবে কাফেরদের হাত থেকে তাঁকে গ্রেফতারই হতে দিতেন না, অথবা বৃষ্টি বর্ষণ করে আগুন নিভিয়ে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ চাইলেন আগুন যেন আগুনই থাকে—প্রজ্জ্বলিত, দাহ্য ও ধ্বংসাত্মক; আর ইব্রাহিম (আ.)-কে যেন সবার চোখের সামনে ধরে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। আর ঠিক তখনই আগুনের পোড়ানোর যে প্রাকৃতিক নিয়ম বা আইন, তা স্তব্ধ করে দেওয়া হলো।

আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন:

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

"আমরা বললাম, হে আগুন! তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।" (সূরা আম্বিয়া-৬৯)

ইব্রাহিম (আ.) যদি পালিয়ে বেঁচে যেতেন, তবে কাফেররা বলত, "যদি আমরা তাঁকে ধরতে পারতাম তবে পুড়িয়ে মারতাম।" আর যদি বৃষ্টি নামত, তবে তারা বলত, "যদি বৃষ্টি না হতো তবে তিনি পুড়ে যেতেন।" কিন্তু ইব্রাহিম (আ.) পালিয়ে যাননি, বৃষ্টিও নামেনি, আগুনও ছিল উত্তপ্ত, তবুও তা ইব্রাহিম (আ.)-কে পোড়াতে পারেনি। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, তাদের যেসব দেবতাদের ব্যাপারে তারা ভাবত যে তারা প্রতিশোধ নেবে, তারা আসলে কোনো উপাস্যই নয়; বরং তারা স্রেফ কিছু মূর্তি, যা কোনো ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। এই মহাবিশ্বের সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা ও কুদরতের অধীন।

আল্লাহ যখন বলেন, "হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও", তখন আগুনের দহন ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় এবং মহাবিশ্বের সব নিয়ম আল্লাহর ক্ষমতার সামনে অসহায় হয়ে পড়ে। তখন তাদের দেবতারাও এই কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে যে, "হে আগুন, আমাদের উপাস্য যে ভেঙেছে তাকে পুড়িয়ে দাও!"

ঈসা (আ.) যখন এসেছিলেন, তখন তাঁর জাতি চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। তাই তিনি তাদের কাছে এমন মু'জিযা নিয়ে এলেন যা ছিল তাদের পারদর্শিতার বিষয়ের মতোই। তিনি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগাক্রান্তদের নিরাময় করতেন। এমনকি তিনি আরও এক ধাপ উঁচুতে চলে গেলেন যেখানে চিকিৎসাবিজ্ঞান পৌঁছাতে পারেনি—তিনি আল্লাহর হুকুমে মৃতকে জীবিত করতেন।

অতএব, রাসূলদের মু'জিযা হলো মহাবিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়মাবলি ভেঙে দেওয়া। ইব্রাহিম (আ.)-এর ক্ষেত্রে আগুনের পোড়ানোর ধর্ম অকেজো হয়ে যায়। মুসা (আ.)-এর ক্ষেত্রে পানি তার তরলতার নিয়ম হারিয়ে ফেলে। পানির নিয়ম হলো সে সমতলে থাকবে—এক জায়গায় উঁচুতে আর অন্য জায়গায় নিচুতে থাকবে না, তার উপরিভাগ সমান হতে হবে। কিন্তু মুসা (আ.) যখন তাঁর লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করলেন, সাগর বিভক্ত হয়ে গেল এবং তার প্রতিটি ভাগ এক একটি বিশাল পাহাড়ের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যা পানির সমস্ত নিয়মকে ভেঙে চুরমার করে দিল। কিন্তু কেন এমনটি ঘটল? কেন সমুদ্র দুই ভাগে ভাগ হয়ে পানির নিয়ম স্তব্ধ হয়ে গেল? কারণ মুসা (আ.) পুরো বিষয়টি আল্লাহর ওপর সঁপে দিয়েছিলেন। কীভাবে? যখন ফেরাউনের দল মুসা (আ.)-এর দলের পিছু নিল, তখন মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গীরা বলল, "আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।" এটি ছিল বাস্তবসম্মত কথা, কারণ সামনে ছিল সমুদ্র আর পেছনে ফেরাউনের বাহিনী। মানুষের তৈরি নিয়মের হিসেবে বিষয়টি একদম পরিষ্কার ছিল। কিন্তু মুসা (আ.) বললেন:

قَالَ كَلَّا

"কখনোই নয়।"

তিনি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে উচ্চকণ্ঠে এটি বলেছিলেন। কেন? কারণ তিনি মানুষের জাগতিক উপায়ের ওপর ভরসা করে বাঁচার দাবি করেননি। তিনি বলেননি যে, "আমরা অমুক পাহাড়ে উঠে বেঁচে যাব" বা "আমরা কোনো উপায়ে সমুদ্র পার হব।" বরং তিনি বলেছিলেন:

قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

"কখনোই নয়, নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার রব আছেন, তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।" (সূরা শুয়ারা- ৬২)

তিনি পুরো বিষয়টিকে মানুষের সীমাবদ্ধ নিয়ম থেকে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার দিকে নিয়ে গেলেন। আর তখনই আল্লাহ্ বললেন,

أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ

"তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করো।" অমনি সমুদ্র ফেটে আলাদা হয়ে গেল। (সূরা শুয়ারা- ৬৩)

কুরআনের চিরন্তন মু'জিযা ও নবীদের মু'জিযার পার্থক্য

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, কুরআনের অলৌকিকত্ব পূর্ববর্তী রাসূলদের মু'জিযা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পূর্ববর্তী রাসূলদের মু'জিযাগুলো প্রকৃতির নিয়ম ভেঙেছে, চ্যালেঞ্জ করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে যার মাধ্যমে এগুলো ঘটছে তিনি আল্লাহর পাঠানো সত্য রাসূল। কিন্তু সেগুলো ছিল কেবল জাগতিক বা দৃশ্যমান অলৌকিক ঘটনা। যারা তা সচক্ষে দেখেছে তারা ঈমান এনেছে, আর যারা দেখেনি তাদের কাছে তা কেবল একটি ঐতিহাসিক সংবাদ হয়ে থেকে গেছে—কেউ চাইলে তা বিশ্বাস করতে পারে, আবার নাও করতে পারে। যদি কুরআনে এগুলোর উল্লেখ না থাকত, তবে হয়তো বলা যেত যে এগুলো কখনোই ঘটেনি।

অতএব, জাগতিক ও দৃশ্যমান মু'জিযা—যা মানুষ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুধাবন করে ও চোখে দেখে—তা কেবল একবারই ঘটে। যারা দেখে তারা বিশ্বাস করে, আর বাকিদের জন্য তা পরে গল্প বা সংবাদ হয়ে যায়। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মু'জিযা হলো একটি বুদ্ধিভিত্তিক, চিরস্থায়ী ও অমর মু'জিযা। আজ যে কেউ বলতে পারে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং তার প্রমাণ হলো এই কুরআন।

আরেকটি বিষয় হলো, আমরা যদি পূর্ববর্তী মু'জিযাগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে দেখব সেগুলো ছিল আল্লাহর "কাজ" (فعل)। আর আল্লাহর কাজ তা ঘটার পর শেষ হয়ে যেতে পারে। মুসা (আ.)-এর জন্য সাগর বিভক্ত হয়েছিল, তারপর আবার স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আগুন ইব্রাহিম (আ.)-কে পোড়ায়নি, কিন্তু পরে তা আবার তার নিজস্ব দহন ক্ষমতায় ফিরে গেছে।

কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মু'জিযা হলো আল্লাহর একটি "গুণ" (صفة), আর তা হলো আল্লাহর বাণী (কালাম)। কাজ শেষ হয়ে যেতে পারে কিন্তু গুণ বা বাণী বক্তার স্থায়িত্বের সাথে চিরকাল স্থায়ী থাকে।

কুরআনের মু'জিযার আরেকটি বড় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়—আগের নবীদের বেলায় মু'জিযা ছিল এক জিনিস আর জীবনবিধান বা কিতাব ছিল অন্য জিনিস। মুসা (আ.)-এর মু'জিযা ছিল লাঠি, আর তাঁর বিধান ছিল তাওরাত। ঈসা (আ.)-এর মু'জিযা ছিল অলৌকিক চিকিৎসা, আর তাঁর বিধান ছিল ইঞ্জিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্ষেত্রে তাঁর মু'জিযাই হলো তাঁর জীবনবিধান (কুরআন); যাতে জীবনবিধানটি স্বয়ং মু'জিযা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে এবং মু'জিযাটি বিধানের ভেতরেই অবস্থান করে।

এই কারণে কুরআনের আগের কিতাবগুলোর সুরক্ষার দায়িত্ব মানুষের ওপর দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কিতাবগুলো রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয়ই আমি এই কুরআন নাজিল করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।" (সূরা হিজর-৯)

কেন এমন হলো?

প্রথমত: কারণ কুরআন নিজেই একটি মু'জিযা। আর এটি মু'জিযা হওয়ার কারণে এর মূল শব্দ ও পাঠ হুবহু টিকে থাকা আবশ্যক, অন্যথায় এর অলৌকিকত্বই হারিয়ে যেত।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ পূর্ববর্তী কিতাবগুলো রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তারা তার এক বড় অংশ ভুলে গিয়েছিল। আর যা ভুলে যায়নি, তার কিছু অংশ তারা গোপন করেছিল। আর যা গোপন করেনি, তা তারা নিজেদের জিহ্বা বাঁকিয়ে বিকৃত করেছিল।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে বিকৃতি, ভুলে যাওয়া এবং পরিবর্তনের মতো ঘটনা ঘটেছিল। এমনকি তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু লিখে বলত যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, যাতে এর বিনিময়ে সামান্য দুনিয়াবী স্বার্থকে হাসিল করতে পারে।

এই কারণে আল্লাহ তায়ালা নিজেই কুরআন সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিলেন। আমরা যদি দুটি ধারা লক্ষ্য করি—একটি হলো কুরআনের বাস্তবায়ন ও এর শিক্ষা অনুযায়ী আমল করার ধারা, এবং অন্যটি হলো কুরআন সংরক্ষণের ধারা; তবে দেখব যে- সময় যত গড়াচ্ছে মানুষের জীবনে কুরআন বাস্তবায়নের ধারা তত দুর্বল হচ্ছে, কিন্তু কুরআন সংরক্ষণের ধারা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমরা যদি বাস্তব জীবনে এই বিধান পুরোপুরি মানতাম তবে এই সুরক্ষা স্বাভাবিক মনে হতো। কিন্তু আমাদের যাপিত জীবনে কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও কুরআন সংরক্ষণের এই ব্যাপকতা সত্যিই অলৌকিক। আমরা আজ সর্বত্র কুরআন দেখতে পাই—প্রতিটি ঘরে, অফিসে ও গাড়িতে। এমনকি অমুসলিমরাও কুরআন যত্ন করে রাখছে এবং বহন করছে।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা দেখতে পাই কোনো একজন জার্মান নাগরিক হয়তো ভাবছেন কীভাবে পুরো কুরআনকে সুন্দর নকশায় একটি পৃষ্ঠার মধ্যে লিখে ফেলা যায়। অন্য কোনো আসমানী কিতাব রেখে তিনি কুরআনের সাথে কেন এমনটি করছেন? জাপান বা ইতালির মতো দেশ কেন পবিত্র কুরআনকে এত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে মুদ্রণ করার জন্য নান্দনিকতা প্রদর্শন করছে?

এটি আসলে এই কারণেই ঘটছে কারণ আল্লাহ তায়ালা আমাদের দেখাতে চান যে তিনিই কুরআন রক্ষা করছেন। আমরা যতই এর বিধান থেকে দূরে সরে যাচ্ছি, এর সংরক্ষণ এবং এর প্রতি যত্ন তত বাড়ছে; যাতে প্রমাণিত হয় যে এর সংরক্ষক স্বয়ং আল্লাহ, এই বিধানের অনুসারীরা নয়।

সারা বিশ্বের জন্য কুরআনের চ্যালেঞ্জ

কুরআনের মু'জিযার এই তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করার পর আমরা পরবর্তী পয়েন্টে যাব। কুরআন হলো আল্লাহর বাণী, যা তিলাওয়াত করা ইবাদত। এটি এসেছে সেই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে যাতে আরবরা অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। যে জাতির মধ্যে এটি নাজিল হয়েছিল—অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কওম—তারা অলঙ্কারশাস্ত্র, সাবলীল ভাষা, চমৎকার উপস্থাপন ও সুন্দর অভিব্যক্তির জন্য বিখ্যাত ছিল। কুরআন তাদের এই পারদর্শিতার জায়গাতেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল। তারা যখন এটি শুনল, তখন তারা মন্ত্রমুগ্ধ ও স্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তাদের অহংকার তাদের সত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখল।

তারা বলতে লাগল, "তিনি একজন জাদুকর।"

এর উত্তর খুবই সাধারণ—জাদুকরের সামনে কি জাদুমুগ্ধ ব্যক্তির কোনো নিজস্ব ইচ্ছা থাকে? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি জাদুকরই হতেন এবং মানুষকে জাদু করতেন, তবে তিনি আপনাদের কেন জাদু করলেন না যাতে আপনারা তাঁর অনুসারী হয়ে যান? জাদুমুগ্ধ ব্যক্তি তো জাদুকরের সামনে নিজের ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে। সে নিজে এসে বলতে পারে না যে, "আমি এই জাদু বিশ্বাস করব আর ওই জাদুটি অবিশ্বাস করব।" জাদুকরের সামনে মানুষ তার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে। সুতরাং, আপনারা যে একদিকে তাঁকে জাদুকর বলছেন আবার অন্যদিকে তাঁর ওপর ঈমান আনছেন না—এটাই প্রমাণ করে যে আপনারা মিথ্যাবাদী।

এরপর তারা বলল, "তিনি একজন কবি।" অথচ আপনারা ভালো করেই জানেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনে কোনোদিন কবিতা বলেননি। তাহলে হঠাৎ করে আপনারা তাঁর ওপর কবিতার অভিযোগ কেন আনছেন?

এরপর তারা বলল, "তিনি একজন পাগল।"

আচ্ছা, একজন পাগল কি কখনো মহান চরিত্রের অধিকারী হতে পারে? পাগলের ক্ষেত্রে তো আপনি জানেনই না যে পরের মিনিটে সে আপনার সাথে কী আচরণ করবে। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, যা তারা খুব ভালো করেই জানত। নবুওয়াত পাওয়ার আগে তারা নিজেরাই তাঁকে 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

আসলে যা ঘটেছিল তা হলো, তারা হতভম্ব ও বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। তারা ছিল আরবী ভাষা ও অলঙ্কারশাস্ত্রের রাজা ও পণ্ডিত। কিন্তু তাদের সামনে এমন এক বাণী এলো যা তাদের অক্ষম করে দিল। নিজেদের এই অসহায়ত্ব দেখে তারা খেই হারিয়ে ফেলল এবং কোনো যুক্তি ছাড়া যা তা বলতে লাগল—কখনো জাদুকর, কখনো পাগল। তীব্র বিস্ময়ের ধাক্কায় তারা তাদের যুক্তি ও প্রমাণ হারিয়ে ফেলেছিল। আর কুরআন তার চ্যালেঞ্জ জারি রেখে বলল—এর মতো একটি বই নিয়ে এসো। তারপর চ্যালেঞ্জ আরও সহজ করে বলল—দশটি সূরা নিয়ে এসো। তারপর আরও সহজ করে বলল—এর মতো একটি মাত্র সূরা নিয়ে এসো। এটিই ছিল কুরআনের প্রথম অলৌকিকত্ব; এটি এমন এক মু'জিযা যা তৎকালীন জাতিকে তাদের নিজস্ব পারদর্শিতার ক্ষেত্রে পরাস্ত করেছিল।

তবে কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ এবং অলৌকিকত্ব কেবল আরবদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তা ছিল গোটা বিশ্বের জন্য। আরবে কুরআনের ভাষাগত অলৌকিকত্ব ছিল আরবদের পারদর্শিতার বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ। কিন্তু কুরআন তো সব জাতি এবং সব ভাষার মানুষের জন্য এসেছে। তাহলে অমুসলিম বা অনারবদের জন্য চ্যালেঞ্জটি কোথায়? তাছাড়া এই কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে।

তাই স্বাভাবিকভাবেই এই কিতাব সব সময় ও সব স্থানের মানুষের জন্য অলৌকিকত্ব বহন করে। এই কারণেই কুরআনের নাজিল হওয়ার সময়ে, নাজিল হওয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে এবং নাজিল হওয়ার পরেও অসংখ্য অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে—যা আজও চলমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, যাতে পৃথিবীতে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ প্রকাশ পায়।

অদৃশ্যের পর্দা উন্মোচন

কুরআন যখন এসেছে, তখন এটি বহু বিষয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো—এটি অদৃশ্যের (গায়েবের) সমস্ত পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছে। এটি সময় ও স্থানের সীমানা ভেঙে দিয়েছে। কীভাবে?

অদৃশ্যের পর্দা মূলত তিনটি: প্রথমটি হলো- স্থানের পর্দা, অর্থাৎ একই মুহূর্তে অন্য কোনো স্থানে কিছু ঘটছে কিন্তু আমি তা জানি না কারণ আমি অন্য জায়গায় আছি।
দ্বিতীয়টি হলো- অতীতের পর্দা, যা সময়ের আবর্তনে আমার থেকে আড়াল হয়ে গেছে এবং আমি তার সাক্ষী ছিলাম না।

আর তৃতীয়টি হলো- ভবিষ্যতের পর্দা, অর্থাৎ আগামীকাল কী ঘটবে তা ভবিষ্যতের পর্দার কারণে আমার কাছে অদৃশ্য। অতএব অদৃশ্যের পর্দা তিনটি: স্থান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ।

আমরা যদি কুরআন পড়ি তবে দেখব এটি অতীতের পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছে। এটি আমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের খবর দেয়, পূর্ববর্তী রাসূলদের কাহিনী শোনায় এবং এমন সব গোপন বিষয় বর্ণনা করে যা কেউ জানত না। আর এটি কার মুখ থেকে বের হচ্ছে? একজন উম্মী (নিরক্ষর) নবীর মুখ থেকে, যিনি পড়তে বা লিখতে জানতেন না। অথচ তিনি অতীতের গভীর রহস্যগুলো অবলীলায় বলে দিচ্ছেন এবং যারা একে মিথ্যা বলছে তাদের চ্যালেঞ্জ করছেন। আল্লাহ তাঁর জন্য অতীতের পর্দা তুলে দিয়েছিলেন।

কুরআনে বারবার আসা "وما كنت" (এবং আপনি ছিলেন না) শব্দগুলো পড়লেই আপনি বুঝতে পারবেন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অতীতের অদৃশ্যের কত খবর দিয়েছেন!

যেমন:

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

"আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না যখন আমি মুসা আলাইহিস সালামকে আদেশ দিয়েছিলাম" (সূরা আল ক্বাসাস-৪৪)

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ

"আপনি তাদের কাছে ছিলেন না যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল যে কে মারইয়াম আলাইহাস সালামের দায়িত্ব নেবে।" (সূরা আলে ইমরান-৪৪)

এর অর্থ হলো—হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ আপনাকে সেই খবর দিয়েছেন এবং অতীতের পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ আরও বলেন:

وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا

"আপনি মাদয়ানবাসীদের মধ্যেও ছিলেন না যে তাদের কাছে আমার আয়াত তিলাওয়াত করবেন...।"(সূরা আল ক্বাসাস-৪৫)

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ

"আপনি তূর পাহাড়ের পাশে ছিলেন না যখন আমি আহ্বান করেছিলাম, বরং এটি আপনার রবের পক্ষ থেকে এক রহমত।" (সূরা আল ক্বাসাস-৪৬)

এভাবে আমরা দেখি যে, কুরআন বিভিন্ন প্রসঙ্গে অতীতের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলদের সঠিক সংবাদ জানিয়েছে। একই সাথে এটি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর সেই অংশগুলোকে সংশোধন করে দিয়েছে যা পাদ্রী ও ইহুদী পণ্ডিতরা বিকৃত করেছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুরআনের মাধ্যমে ইহুদী ও খ্রিস্টান পণ্ডিতদেরকে চ্যালেঞ্জ করতেন এবং বলতেন—এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওরাত বা ইঞ্জিলে আছে, আর এটি তোমরা তাওরাত বা ইঞ্জিলে বিকৃত করেছ। তারা এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে কোনো জবাব দিতে পারত না। অতীতের পর্দা উন্মোচন করার ক্ষেত্রে কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ পূর্ববর্তী আসমানী বার্তাগুলোর এত সূক্ষ্ম রহস্য পর্যন্ত পৌঁছেছিল যে, তা তাদের কিতাবের বিকৃতি ও গোপন করা বিষয়গুলোকে একদম স্পষ্ট করে দিয়েছিল এবং তাদের চ্যালেঞ্জ করেছিল যে পারলে কুরআনের কথা মিথ্যা প্রমাণ করুক। কিন্তু তারা তা পারেনি। এরই একটি উদাহরণ হলো সূরা মারইয়ামে আল্লাহ তায়ালার বাণী:

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ

"ইনিই হলেন মারইয়াম আলাইহাস সালামের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম। এটিই সত্য কথা, যে বিষয়ে তারা সন্দেহ পোষণ করে।" (সূরা মারইয়াম-৩৪)

স্থানের পর্দা ও অন্তরের গোপন রহস্য উন্মোচন

এরপর এলো দ্বিতীয় বিষয়। আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মাদ (আ.)-এর জন্য স্থানের পর্দা তুলে দিলেন। আর এটি ঘটল মানুষের মনের সবচেয়ে সূক্ষ্ম বিষয়—অর্থাৎ অন্তরের ভাবনার ক্ষেত্রে। এখানে শুরু করার আগে আমাদের মাথায় রাখা উচিত যে, কুরআন আল্লাহর বাণী যা তিলাওয়াত করাও ইবাদত। এটি কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ছাড়াই চিরকাল টিকে থাকবে এবং কেউ এটি স্পর্শ বা বিকৃত করার সাহস পাবে না। অতএব, এই বাণী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর একটি বড় দায়িত্ব ছিল। কুরআন যদি এমন কোনো খবর দিত যা পরে ভুল প্রমাণিত হতো, তবে পুরো দ্বীনের ভিত্তিই ভেঙে পড়ত।

কুরআন যে কথাটি বলেছে তার গুরুত্ব স্পষ্ট করার পর আয়াতটি লক্ষ্য করুন, যেখানে আল্লাহ বলছেন:

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ

"এবং তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ কেন আমাদের শাস্তি দেন না?" (সুরা মুজাদালাহ-৮)

এই কথার অর্থ কী? এটি হলো চ্যালেঞ্জের চরম সীমা। কুরআন এখানে তাদের বলছে না যে—আমি শুধু অতীতের পর্দা ভেঙেছি বা দূরের কোনো স্থানের খবর দিচ্ছি যা তোমরা দেখছ না; বরং কুরআন বলছে: "আমি তোমাদের মনের ভেতরের পর্দা ছিঁড়ে ফেলব এবং তোমাদের অন্তরে কী চলছে, তোমাদের ঠোঁট না নাড়িয়ে মনে মনে কী ভাবছ—তা জানিয়ে দেব।"

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য কাফেরদের শুধু এইটুকু বললেই চলত যে, "আমরা তো মনে মনে এমন কিছু ভাবিনি!" তারা যদি সত্যিই মনে মনে তা না ভাবত, তবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার জন্য এর চেয়ে বড় সুযোগ আর হতো না। কিন্তু কুরআন

মানুষের মনের ভেতরে প্রবেশ করেছিল—আর তারা কারা ছিল? তারা ছিল সেইসব অবিশ্বাসী কাফের, যাদের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল ইসলামকে ধ্বংস করা। আল্লাহ এমন এক বাণীতে (যা কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থেকে তিলাওয়াত করা হবে) তাদের গোপন কথা ফাঁস করে দিয়ে বললেন:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ

"আপনি কি তাদের দেখেননি, যাদের কানাকানি করতে নিষেধ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপ, সীমা লঙ্ঘন ও রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে গোপন পরামর্শ করে? তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন শব্দে সালাম করে যা দিয়ে আল্লাহ আপনাকে সালাম করেননি। আর তারা মনে মনে বলে, আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দেন না কেন? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট, যেখানে তারা প্রবেশ করবে। কত নিকৃষ্ট সেই গন্তব্য!" (সুরা মুজাদালাহ-৮)

মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন। কাফেরদের মনের ভেতর কী চলছিল আল্লাহ তা হুবহু বলে দিলেন। এর চেয়ে বড় অলৌকিক চ্যালেঞ্জ আর কী হতে পারে? এটি মানুষের তৈরি সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চেয়েও উর্ধ্বে। এমনকি অবিশ্বাসী কাফেররা যা খুব সাবধানে লুকিয়ে রাখতে চাইত, কুরআন তা-ই প্রকাশ করে দিত। মানুষ যখন কোনো কিছু লুকাতে চায় এবং সে যখন অবিশ্বাসী হয়, তখন সে এসে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলে যে সে সত্য বলছে। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনের মাধ্যমে এদের মুখোশ খুলে দেন এবং চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন:

وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

"এবং তারা আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, আমরা যদি পারতাম তবে নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে বের হতাম। তারা নিজেদের ধ্বংস করছে এবং আল্লাহ জানেন যে নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।" (সুরা তাওবাহ-৪২)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

"তারা তোমাদের সামনে কসম খাবে যেন তোমরা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হও। যদি তোমরা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হও, তবে জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়ের ওপর সন্তুষ্ট হবেন না।" (সুরা তাওবাহ- ৯৬)

এবং আল্লাহ বলেন:

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

"এবং তারা জেনে-বুঝে মিথ্যা কসম খায়।" (আল মুজাদালাহ- ১৪)

অতএব, কুরআন এখানে কাফেরদের মনের গোপন রহস্য এবং তাদের মিথ্যাকে সবার সামনে উন্মোচন করে দিল। গোটা সমাজের সামনে তাদের ভণ্ডামি ও মুনাফিকি প্রকাশ করে তাদেরকে অপমানিত ও অপদস্থ করল। এটি যদি সত্য না হতো তবে তারা সহজেই বলতে পারত যে, "আমরা মিথ্যা বলিনি, আমরা সত্য বলছি এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বাণীর দাবি করছেন তা ভুল।" কিন্তু কুরআন তাদের মনের পর্দা এমনভাবে ছিঁড়ে ফেলেছিল যে তারা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং কোনো জবাবই তারা দিতে পারেনি। তারা মানুষের সামনে লজ্জিত হয়ে স্রেফ আড়ালে চলে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি।

যদি এই কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে মানুষের মনের ভেতরের এই সূক্ষ্ম রহস্য জানা কখনো সম্ভব হতো না। বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত মানুষের

মনের এই গভীর রহস্যে পৌঁছাতে পারেনি। অথচ কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকার চ্যালেঞ্জ নিয়ে মানুষের মনের গোপন বিষয়কে একদম পরিষ্কার করে দেয়। এর চেয়ে বড় মু'জিযা আপনি আর কী চান?

ভবিষ্যতের পর্দা উন্মোচন

এরপর কুরআন ভবিষ্যতের পর্দা উন্মোচন করল। ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলার বিষয়টি কয়েকটি ধাপে হওয়া প্রয়োজন ছিল:-

প্রথমটি হলো- সমসাময়িক যুগের জন্য—যাতে তৎকালীন বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সবাই বুঝতে পারে যে এটিই সত্য। আর দ্বিতীয়টি হলো- দূরবর্তী ভবিষ্যতের জন্য—যাতে কুরআনের পর আগত প্রতিটি যুগের মানুষ বুঝতে পারে যে এটি আল্লাহর সত্য কিতাব। এই কারণে সমসাময়িকদের জন্য ছিল নিকটবর্তী ভবিষ্যতের কিছু ঘটনার চ্যালেঞ্জ, আর পুরো বিশ্বের জন্য ছিল মহাবিশ্বের নানা বৈজ্ঞানিক সত্যের চ্যালেঞ্জ।

এখানে আমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হলো কুরআনে 'সীন' (س - যা আরবী ভাষায় ভবিষ্যৎ নির্দেশক হরফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়) অক্ষরের ব্যবহার। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'সীন' কেবলমাত্র ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু কুরআন সংরক্ষিত এবং এর তিলাওয়াত ইবাদত, তাই এর কোনো শব্দ পরিবর্তন বা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এখন কুরআন যদি ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার ব্যাপারে 'সীন' ব্যবহার করে ভবিষ্যদ্বাণী করে, তবে তা সরাসরি ঈমানের সত্যতার সাথে জড়িয়ে যায়। যদি সেই ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হতো, তবে তা দ্বীনের মূলে আঘাত করত।

সুতরাং, কুরআনের বক্তাকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে ভবিষ্যতে এটি ঘটবেই। কোনো মানুষের কি এই ক্ষমতা আছে যে, সে এক ঘণ্টা পর তার সাথে কী ঘটবে তা নিশ্চিত করে বলতে পারে? দিন বা বছর তো দূরের কথা!
উত্তর হলো—কারও এই ক্ষমতা নেই। কারণ মানুষের ঘটনা ঘটানোর ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত; তার কাছ থেকে সময় ও স্থান আড়াল করা হয়েছে।

আমি যদি বলি যে, আমি আগামী বছর এই জায়গায় একটি ভবন তৈরি করব, আমি তো গ্যারান্টি দিতে পারছি না যে আমি আগামী এক ঘণ্টা বেঁচে থাকব কি না। আবার এমনও হতে পারে যে সরকার এসে ওই জায়গায় একটি হাসপাতাল বা রাস্তা বানিয়ে

দিল। সুতরাং, জাগতিক কোনো বিষয়ে মানুষ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। কিন্তু যিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন, তিনি হলেন একমাত্র ক্ষমতার মালিক—অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা।

হাজার বছর পরের কোনো ঘটনা বলা মানুষের সাধ্যের অতীত। কিন্তু কুরআন কয়েক বছর পরের ঘটনা এবং হাজার বছর পরের ঘটনা—উভয়টিই নিখুঁতভাবে বলেছে। কারণ যিনি এটি বলেছেন তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ।
আল্লাহ তায়ালার এই বাণীটি লক্ষ্য করুন:

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

"শীঘ্রই এই দল পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে।" (সূরা আল ক্বামার- ৪৫)

এই সূরা আল-ক্বামার যখন মক্কায় নাজিল হয়, তখন মুসলিমরা ছিলেন সংখ্যায় খুবই অল্প এবং দুর্বল। এমনকি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছিলেন, "কোন দল পরাজিত হবে? যেখানে আমরা নিজেদেরই রক্ষা করতে পারছি না!"

অথচ কুরআন মক্কাতেই ভবিষ্যদ্বাণী করছে যে ইসলাম বিজয়ী হবে এবং কাফেরদের এই দল পরাজিত হয়ে পিঠ দেখিয়ে পালাবে। তখন মুসলিমদের নিজেদের রক্ষা করার ক্ষমতাটুকুও ছিল না, কিন্তু আল্লাহর কথার ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। পরবর্তীতে আমরা এক অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখতে পাই—ইসলামের চরম শত্রু ওয়ালীদ বিন মুগীরা, যে তার অহংকার ও একগুঁয়েমির জন্য পরিচিত ছিল, তার ব্যাপারে কুরআন বলল:

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ

"শীঘ্রই আমি তার নাকের ওপর দাগ দিয়ে দেব (তাকে আঘাত করব)।" (সূরা আল ক্বালাম-১৬)

কুরআন এখানে আঘাতের নির্দিষ্ট স্থান (নাক) নির্ধারণ করে দিল। আর ঠিক তা-ই ঘটেছিল বদরের যুদ্ধে; তার নাকে এমন এক আঘাত লেগেছিল যার দাগ চিরকাল রয়ে গিয়েছিল। এক ঘণ্টা পর কী ঘটবে তা যেখানে কেউ জানে না, সেখানে কে এত নিখুঁতভাবে আঘাতের স্থান নির্ধারণ করতে পারে?

আবু লাহাবের ঘটনা ও রোম-পারস্য যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী

ভবিষ্যতের আরেকটি আয়াতে আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিলাওয়াত করলেন:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

"আবু লাহাবের হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনো কাজে আসেনি। শীঘ্রই সে প্রবেশ করবে লেলিহান আগুনে। আর তার স্ত্রীও—যে লাকড়ি বহনকারী, তার গলায় থাকবে খেজুর পাতার পাকানো রশি।" (সূরা লাহাব ১-৫)

এই আয়াতটি কার ব্যাপারে নাজিল হয়েছিল? রাসূলের আপন চাচা এবং ইসলামের ঘোর শত্রু আবু লাহাবের ব্যাপারে। আবু লাহাব কি এই আয়াতটিকে ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারত না? এই আয়াত তো তাকে বলেই দিয়েছিল, "আবু লাহাব, তুমি কাফের অবস্থায় মারা যাবে এবং জাহান্নামের আগুনে পুড়বে।"

আবু লাহাবের জন্য ইসলামকে মিথ্যা প্রমাণ করার খুব সহজ একটা উপায় ছিল—সে যদি স্রেফ মুসলিমদের মাঝে গিয়ে কপটতা বা লোকদেখানো হিসেবেও বলে দিত:

আশহাদূ আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদূ আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ... তথা- "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

সে ভণ্ডামি করে এটি বলার পর বলতে পারত, "মুহাম্মাদ তো তোমাদের বলেছিল যে আমি কাফের হয়ে মারা যাব এবং এটি আল্লাহর বাণী। এই দেখো, আমি ইসলাম গ্রহণ করে প্রমাণ করে দিলাম যে মুহাম্মাদ মিথ্যাবাদী!"

আবু লাহাবের যদি সামান্যতম বুদ্ধি থাকত তবে সে এটি করতে পারত। কিন্তু এই চিন্তাটি করার ক্ষমতাও আল্লাহ তার বুদ্ধি থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। সে আজীবন কাফের ও মুশরিক রয়ে গেল এবং কাফের অবস্থাতেই মারা গেল। আবু লাহাব কাফের হয়ে মারা যাবে—এই ভবিষ্যদ্বাণী করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না; কারণ খালেদ বিন ওয়ালীদ, আমর ইবনুল আস, ওমর ইবনুল খাত্তাবের মতো বড় বড় মুশরিকরা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাহলে কীভাবে নিশ্চিত করে বলা হলো যে আবু লাহাব কখনোই (এমনকি লোকদেখানো হিসেবেও) ইসলাম গ্রহণ করবে না? মু'জিযা এখানেই যে, কুরআন একজন শত্রুর ঐচ্ছিক বিষয়ের ওপর ভবিষ্যদ্বাণী করেছে এবং নিশ্চিত করেছে যে সে তা কখনই করবে না। কারণ যিনি কুরআন নাজিল করেছেন, তিনি জানতেন আবু লাহাবের মাথায় এই চিন্তা কখনোই আসবে না। এর চেয়ে বড় অলৌকিকত্ব আর কী হতে পারে?

এবার আমরা দ্বিতীয় পয়েন্টে আসি—কুরআন যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও পরবর্তী যুগের পুরো পৃথিবীর জন্য অদৃশ্যের কী কী প্রাকৃতিক নিয়ম ও বৈজ্ঞানিক সত্যের খবর এনেছে? এ বিষয়ে অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। তবে আমি কুরআনের যুগের অমুসলিমদের প্রেক্ষাপটে একটি বড় ঘটনা উল্লেখ করছি। সে সময় আরব উপদ্বীপের পাশে দুটি বিশাল পরাশক্তি বা সাম্রাজ্য ছিল—রোমান সাম্রাজ্য এবং পারস্য সাম্রাজ্য।

রোমানরা ছিল আহলে কিতাব (খ্রিস্টান); যদিও তারা মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াত বিশ্বাস করত না, তাও আল্লাহর প্রতি এবং আসমানী মূলনীতির প্রতি তাদের এক ধরনের বিশ্বাস ছিল। আর পারস্যের লোকেরা (মজুসী বা অগ্নিপূজক) ছিল কাফের ও ধর্মহীন, তারা কোনো আসমানী কিতাব মানত না। স্বাভাবিকভাবেই মুসলিমদের হৃদয়ের কাছাকাছি ছিল রোমানরা (আহলে কিতাব হওয়ার কারণে), আর মক্কার কাফেরদের পছন্দের ছিল পারস্যের লোকেরা (অবিশ্বাসী হওয়ার কারণে)।

এই দুই দেশের মধ্যে যখন যুদ্ধ হলো, তখন রোমানরা পরাজিত হলো এবং পারস্যের লোকেরা বিজয়ী হলো। মক্কার কাফেররা খুশি হলো যে কুফর বিজয়ী হয়েছে, আর মুসলিমরা দুঃখ পেল যে বিশ্বাসী দল হেরে গেছে। ঠিক এই মুহূর্তে আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়া তায়ালা মুসলিমদের দুঃখ দূর করার জন্য এমন এক বাণী নাজিল করলেন যা চিরকাল সংরক্ষিত থাকবে:

الم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

"আলিফ-লাম-মীম। রোমানরা পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী এলাকায়। এবং তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যে। পূর্বের ও পরের সব সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। আর সেদিন মুমিনরা আল্লাহর সাহায্যে আনন্দিত হবে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" (সূরা রূম ১-৫)

এরপর চ্যালেঞ্জটিকে আরও সুনির্দিষ্ট করে কুরআন বলল:

وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

"এটি আল্লাহর ওয়াদা, আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (সূরা রূম- ৬)

কী অদ্ভুত বিষয়! হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি কয়েক বছর পর রোম ও পারস্যের মধ্যে হতে যাওয়া যুদ্ধের ফলাফল আগে থেকেই নির্ধারণ করতে পারেন? একজন সামরিক কমান্ডার, সে যত বড় জিনিয়াসই হোক না কেন, যুদ্ধ শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা পরের ফলাফল নিশ্চিত করে বলতে পারে না। সেখানে কুরআন কয়েক বছর আগেই পরের কথা বলে দিচ্ছে যে রোমানরা আবার জিতবে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি নিজে এই যুদ্ধ দেখার জন্য আরও কয়েক বছর বেঁচে থাকবেন? বিষয়টি এত নিশ্চিত ছিল যে হযরত আবু বকর (রা.) কাফেরদের সাথে এই আয়াতের সত্যতার ওপর বাজি ধরেছিলেন।

এটি তখন ঈমানের এক বিরাট পরীক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এটিই কুরআন—আল্লাহর বাণী, ঈমানের মূল ভিত্তি। এটি অনারবদের একটি জাগতিক ঘটনার সত্য ভবিষ্যদ্বাণী করল। কাফেররা বলেছিল কুরআন মিথ্যা, আর মুমিনরা বলেছিল এটি সত্য। যদি পরবর্তীতে রোম ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ না হতো, কিংবা রোমানরা আবার হেরে যেত, তবে কি কোনো মানুষ এই কুরআনকে বিশ্বাস করত বা এই নতুন ধর্মে দীক্ষিত হতো?

যদি এই কুরআন মুহাম্মাদ (সা.) নিজের থেকে লিখতেন, তবে তিনি কেন এমন এক ঝুঁকিপূর্ণ অদৃশ্যের বিষয়ে জড়াতে গেলেন যা তাঁর কাছে কেউ দাবিই করেনি? কেউ তো তাঁকে এই চ্যালেঞ্জ দেয়নি! কিন্তু আসল কথা হলো, এর বক্তা স্বয়ং আল্লাহ এবং চালিকাশক্তিও আল্লাহ। তাই কুরআনে যা নাজিল হয়েছিল তা ঘটা অবধারিত ছিল। কারণ আল্লাহর সামনে সময় বা স্থানের কোনো পর্দা নেই। আর ঠিক তা-ই ঘটেছিল, রোমানরা পারসিয়ানদের ওপর বিজয়ী হয়েছিল—ঠিক যেভাবে কুরআন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। এভাবে কুরআন নাজিল হওয়ার সময়েই অমুসলিম ও অনারবদের চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং ৭-৮ বছর আগে তাদের ভবিষ্যৎ জানিয়ে দিয়েছিল যেন তারা ঈমান আনে।

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে কুরআন তার নাজিল হওয়ার সময়েই আরব ও অনারব উভয়কে চ্যালেঞ্জ করেছিল। কিন্তু আমরা জানি কুরআনের কোনো নির্দিষ্ট কাল বা পাত্র নেই, এটি কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকবে। তাহলে এটি আগামী প্রজন্মগুলোকে কীভাবে চ্যালেঞ্জ করবে?

অবশ্যই কুরআনের এমন একটি স্থায়ী মু'জিযা থাকতে হবে যা প্রতিটি প্রজন্মকে নতুন কিছু দেবে—যা আগের প্রজন্ম পায়নি। আর বাস্তবে তা-ই ঘটেছে। কুরআনে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা নাজিল হওয়ার সময় কাউকে বললে মানুষ হয়তো তাকে পাগল বলত। কিন্তু সেগুলো এসেছে পরবর্তী যুগের মানুষের জন্য—যাতে তা আজ পর্যন্ত এবং আগামী দিনগুলোতেও মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

কাফের হয়েও কুরআনের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে

আজকাল আমরা ঈমান, আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর রুবুবিয়্যাতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ ও সংশয় শুনতে পাই—যেমন- কাকতালীয়ভাবে কোন কিছু হয়ে যাওয়া বা সমাপতন নীতি (قانون الصدفة / Law of Chance), ডারউইনের বিবর্তনবাদ (نظرية داروين) কিংবা আত্মার আগে পদার্থের সৃষ্টি হওয়ার মতবাদ—এসব কিছুর কথাই কুরআন আগে থেকেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছে এবং আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। কুরআন আমাদের সতর্ক করেছে যে, এমন কিছু বিভ্রান্তকারী মানুষ আসবে যারা আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং মানব সৃষ্টির ব্যাপারে তোমাদের সামনে মিথ্যা গল্প বলবে।

কুরআনে ভ্রূণতত্ত্ব (**Embryology**) নিয়ে যে কথা বলা হয়েছে, তা যদি পূর্ণ সুনিশ্চিত বিশ্বাসের সাথে না বলা হতো, তবে কুরআন নিজেই নিজেকে ধ্বংস করার হাতিয়ার তুলে দিত। কারণ এই কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। এখন হাজার বছর পর বিজ্ঞান এসে যদি প্রমাণ করে দিত যে কুরআনের বলা তথ্য ভুল, তবে তো গোটা ঈমানের ভিত্তিই হারিয়ে যেত! কিন্তু আসল কথা হলো, এর বক্তা স্বয়ং আল্লাহ এবং এর বাস্তবায়নকারীও আল্লাহ।

কুরআনের অলৌকিকত্ব কখনো থেমে যায়নি এবং থামবেও না। কুরআন যেমন তার নাজিলের যুগে কাফেরদের অন্তরের গোপন কথা এবং তাদের ভবিষ্যৎ পরিণতি জানিয়ে তাদের চ্যালেঞ্জ করেছিল; ঠিক তেমনি এটি এই আধুনিক যুগেও কাফেরদের চ্যালেঞ্জ করছে। এমনকি এই সময়ে বাস করা কাফেরদেরই কুরআন ব্যবহার করছে। কিসে ব্যবহার করছে? ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য! ঠিক যেভাবে নাজিলের যুগেও তাদেরকে ঈমানের স্বপক্ষে ব্যবহার করা হয়েছিল।

কাফের এবং বিভ্রান্তকারীদের একমাত্র লক্ষ্য হলো এই দ্বীনকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। কিন্তু চৌদ্দশত বছর পর আজ কুরআন এই কাফেরদের দিয়েই প্রমাণ করাচ্ছে যে আল্লাহর দ্বীন সত্য এবং এই কিতাব আল্লাহর বাণী, যা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর এটিই আমাদের আজকের আলোচনার মূল বিষয়।

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন: "কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না", কিংবা বলেন: "তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটা জানে, আর পরকাল সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গাফেল (অমনোযোগী)"—তখন তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, মানুষের জ্ঞানের পরিধি হলো কেবল এই দুনিয়ার বাহ্যিক জীবন পর্যন্ত।

জ্ঞান মূলত দুই প্রকার। এক প্রকার জ্ঞান আল্লাহ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ সেখানে নিজের ইচ্ছেমতো কোনো বাধা বা সীমা ছাড়াই গবেষণা ও কাজকর্ম করতে পারে। আর দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান এমন, যা নিয়ে গবেষণা করার স্বাধীনতা মানুষের নেই; কারণ মানুষ সে সম্পর্কে কিছুই জানে না। এই দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান হলো—তুমি এই কাজটি করো, ওই কাজটি করো না, এই উপায়ে আমার নৈকট্য লাভ করো, ওই বিষয়টি বর্জন করো ইত্যাদি। এগুলো মানুষের নিজস্ব কোনো বুদ্ধি বা ইজতিহাদ নয়; কারণ উপাস্য স্বয়ং তাঁর ইবাদতকারীকে বাতলে দেন যে কীভাবে তাঁর মহিমা ঘোষণা করতে হবে।

যেকোনো বিষয়ে তর্ক বা আলোচনা সমমানের বা কাছাকাছি বুদ্ধিসম্পন্নদের মধ্যে হওয়া উচিত। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার বুদ্ধি আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কাছাকাছি হতে পারে? কেউই নেই। সুতরাং, আমরা 'কী করতে হবে' আর 'কী বর্জন করতে হবে'—তা সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করি এবং সুন্নাহর মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা পাই।

পক্ষান্তরে, জীবনের অন্যান্য জাগতিক কাজকর্ম এবং মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে গবেষণা, চিন্তাভাবনা এবং তা থেকে কল্যাণকর সত্য আবিষ্কার করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা যদি কুরআনে এই গবেষণার বিষয়গুলো খুঁজতে যাই, তবে আল্লাহ তায়ালার এই বাণীতে তা পেয়ে যাব।

সৃষ্টিজগতের বৈচিত্র্য ও বিজ্ঞানীদের পরিচয়

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ

"তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করি? আর পাহাড়সমূহের মধ্যে রয়েছে সাদা ও লাল রঙের বিভিন্ন আভা এবং কুচকুচে কালো রঙের পথ। আর একইভাবে মানুষ, জীবজন্তু ও গৃহপালিত পশুর মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন রঙ।" (সূরা ফাতির-২৭)

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষ সম্পর্কে কথা বলেছেন। এরপরই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই (বিজ্ঞানীরাই) তাঁকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির-২৮)

এখানে 'জ্ঞানী' বা 'বিজ্ঞানী' বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? যারা আল্লাহর সৃষ্টি—জড়পদার্থ, প্রাণী, উদ্ভিদ ও মানুষ নিয়ে গবেষণা করেন। এই কারণে আল্লাহ তায়ালা একই শ্রেণীর জিনিসের মধ্যে বৈপরীত্য বা বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন। যদি সবকিছু একই রকম হতো তবে এই বৈচিত্র্য থাকত না।

আল্লাহর এই বাণী: "বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল"—এর দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল। কেন ফলমূলের রঙ আলাদা হয়? রঙ এবং প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক কী?

যেমন ধরুন, গবেষণায় দেখা গেছে যে উদ্ভিদ 'কৈশিক নালী' বা ক্যাপিলারি অ্যাকশন (capillary action) (গাছের ভেতরের চুলের মতো চিকন নালি মাটি থেকে পানি টেনে নিয়ে গাছের সব অংশে পৌঁছে দেয়- এটাই কৈশিক নালি প্রক্রিয়া- অনুবাদক) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান বা তরল গ্রহণ করে। এখানে আমাদের একটু থামা দরকার। এই কৈশিক নালীগুলোর কি নিজস্ব কোনো বিচারবুদ্ধি আছে? তারা কি বাছাই করতে পারে? আমরা যদি একটি পাত্রে বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত একটি তরল রাখি এবং তাতে কৈশিক নালী ডুবিয়ে দিই, তবে দেখব তরলটি পাত্রের স্তরের চেয়ে উঁচুতে উঠে এসেছে। কিন্তু প্রতিটি নালী কি আলাদা আলাদা উপাদান বেছে নেয়, নাকি মিশ্রণে থাকা সব উপাদানই একসাথে শুষে নেয়? সব উপাদানই শুষে নেয়।

কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিষয়টি এমন নয়। আমি উচ্ছে বা তিতা করলার গাছের পাশেই আখের গাছ রোপণ করছি। একটি মিষ্টি হচ্ছে আর অন্যটি তিতা হচ্ছে। অথচ দুটি গাছই একই মাটি থেকে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় উপাদান গ্রহণ করছে। এর মানে হলো সেখানে একটি বাছাই বা নির্বাচনের প্রক্রিয়া কাজ করছে, যাকে বলা হয় 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' । নির্বাচন মানে হলো অনেকগুলো বিকল্পের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া—অর্থাৎ এটি বর্জন করে ওটি গ্রহণ করা। এই কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন:

يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ

"এগুলোকে একই পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয়, অথচ স্বাদের দিক থেকে আমি তাদের একটিকে অন্যটির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিই।" (সূরা রাদ-৪)

কৈশিক নালীর ধর্ম হলো সে কোনো বৈষম্য ছাড়াই পুরো তরলের সাথে কাজ করে। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তরল ওপরে ওঠার প্রাকৃতিক ধর্ম এক জিনিস, আর উদ্ভিদের নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টি উপাদান বেছে নেওয়ার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

এরপর জড়পদার্থের দিকে আসা যাক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পাহাড় সম্পর্কে বলেছেন:

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

"আর পাহাড়সমূহের মধ্যে রয়েছে সাদা ও লাল রঙের বিভিন্ন আভা এবং কুচকুচে কালো রঙের পথ।" (সূরা ফাতির-২৭)

এটি হলো ভূবিদ্যার (**Geology**) আলোচনা, যা নিয়ে আজ বড় বড় ভলিউমের বই লেখা হচ্ছে। এরপর মানুষের কথা এবং জগতের সমস্ত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আর এ সবকিছুর পরেই আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির-২৮)

কাদেরকে জ্ঞানী বলা হয়েছে? যারা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ভাবেন। সুতরাং ‘বিজ্ঞানী’ বা ‘জ্ঞানী’ শব্দটা তাদের জন্যই প্রযোজ্য যারা আল্লাহর সৃষ্টি—তা জড়বস্তু হোক, প্রাণী হোক বা উদ্ভিদ হোক—তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। যেকোনো সচল বা সক্রিয় মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে এই জাগতিক জ্ঞানগুলোর শেষ সীমানায় পৌঁছাতে পারে। এর প্রমাণ হলো, আপনি যদি মানবজাতির কল্যাণে আসা যেকোনো আবিষ্কারের ইতিহাসের দিকে তাকান, তবে দেখবেন তা কোনো না কোনো মানুষের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণেরই ফল। সাধারণ মানুষের মতো বিষয়টি তাদের চোখ এড়িয়ে যায়নি। বিজ্ঞান মূলত গবেষণাগার, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।

জাগতিক বিজ্ঞান ও রূহের রহস্য

আমরা জাগতিক বিজ্ঞান নিয়ে অনেক দূর চলে যাই, কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা বিজ্ঞানের আসল ক্ষেত্র ও গবেষণাগারের পরিধি হারিয়ে ফেলি। যেমন- আমি যখন বলি 'পদার্থের আগে আত্মা (রূহ)' অথবা 'আত্মার আগে পদার্থ', তখন আমরা মানুষের সৃষ্টির দুটি উপাদান নিয়ে বিতর্ক করছি—যার সৃষ্টির সময় আমরা কেউ উপস্থিত ছিলাম না এবং যার ওপর আমরা কোনো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা চালাতে পারি না। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহর জ্ঞানের বিষয়। তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাদের বলতে পারেন কীভাবে এই সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। এই কারণে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন:

مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির সময় আমি তাদেরকে উপস্থিত রাখিনি এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়েও নয়।" (সূরা কাহাফ- ৫১)

সুতরাং, এটি এমন এক বিষয় যেখানে মানুষের বিজ্ঞান কখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে না। কেন? কারণ, আমরা সেই সৃষ্টির সময়ে উপস্থিত ছিলাম না, নিজেদের চোখে তা দেখিনি এবং গবেষণাগারে তার পুনরাবৃত্তি বা পরীক্ষা করতে পারব না। তবে আমরা কানের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে এই সংবাদ শুনেছি, যা আমাদের জন্য এক 'গায়েব' বা অদৃশ্যের বিষয়। আর যেহেতু বিষয়টি আমাদের কাছে অদৃশ্য, তাই যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে জানাচ্ছেন যে আমি কীভাবে সৃষ্টি হয়েছি।

আমি নিজে তো জানি না কীভাবে আমি সৃষ্টি হয়েছি! এই কারণে আমি বৈজ্ঞানিকভাবে মানুষের দুটি মূল উপাদান নিয়ে এবং কোনটি আগে এসেছে তা নিয়ে কথা বলতে পারি না। যদি কেউ জোর করে এই বিষয়ে গবেষণা করতে চায়, তবে সে এমন এক অকেজো জ্ঞানে নিজেকে ব্যস্ত রাখল যা তাকে কোনো উপকার দেবে না, বরং উল্টো তার অজ্ঞতা তার ক্ষতি করবে। কারণ সে যা বলছে তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করার কোনো ক্ষমতা তার নেই।

পরীক্ষার মাধ্যমে আমি একটা পদার্থকে ধরে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু আমি আত্মাকে (রূহ) ধরে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যেতে পারি না। বিজ্ঞান কাজ করে এক জড় বস্তুর ওপর, যা জড় গবেষণাগারে প্রবেশ করানো যায় এবং যা জড় ও স্থির কিছু সত্য সামনে এনে দেয়। এটাই কি বাস্তবতা নয়?

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, পৃথিবীর যুদ্ধরত বা বিপরীতমুখী দলগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানের মূল নীতি নিয়ে কোনো মতবিরোধ নেই, তাদের বিরোধ কেবল নিজেদের খেয়ালখুশি এবং রাজনৈতিক মতবাদ বা থিওরি নিয়ে। পৃথিবীতে 'আমেরিকান বিদ্যুৎ' বা 'রাশিয়ান বিদ্যুৎ' বলে আলাদা কিছু নেই; কিংবা 'জার্মান রসায়ন' বা 'ইংলিশ রসায়ন' বলেও কিছু নেই। পৃথিবীর যেকোনো দেশের রসায়ন বিজ্ঞান একই ধরনের জড় পরীক্ষার অধীন, যার নিজস্ব কোনো পক্ষপাত বা আবেগ নেই। এই কারণে ল্যাবরেটরিটা ব্রিটিশ হোক, আমেরিকান হোক বা সোভিয়েত হোক—ফলাফল সবসময় একই আসবে।

কিন্তু মতবিরোধ তখনই শুরু হয় যখন মানুষের খেয়ালখুশি, স্বার্থ এবং মনগড়া থিওরি বা মতবাদ এর মধ্যে প্রবেশ করে। আমরা যখন মানুষের প্রবৃত্তির চাহিদার দিকে তাকাই, তখন দেখব সেগুলো কেবল ভিন্ন নয়, বরং একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন—পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ, ঈমান ও নাস্তিকতা এবং ধর্মকে অস্বীকার করা। কেন এমন হয়? কারণ এখানে মানুষের প্রবৃত্তি ও অহংকার প্রবেশ করে আসল বৈজ্ঞানিক বিষয়টিকে নষ্ট করে দেয় এবং সত্যকে আড়াল করে।

মানব সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় এবং বিভ্রান্তকারীদেরকে চ্যালেঞ্জ

আমরা যদি মানুষের সৃষ্টির কথা ধরি, তবে এই সৃষ্টির জ্ঞান আমরা লাভ করি স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কী বলেছেন? তিনি বলেছেন: আমি তোমাকে মাটি (تراب) থেকে সৃষ্টি করেছি, কাদা (طين) থেকে সৃষ্টি করেছি, দুর্গন্ধময় পচা কাদা (حمأ مسنون) থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পোড়ামাটির মতো শুষ্ক ঠনঠনে কাদা (صلصال كالفخار) থেকে সৃষ্টি করেছি। এগুলো সৃষ্টির উপাদানের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নয়, বা মূল উপাদানের ভিন্নতা নয় (কারণ মূল উপাদান সেই মাটিই); বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের মাটি থেকে শুরু করে মানবদেহের বিভিন্ন রূপান্তরের পর্যায়গুলো দেখাচ্ছেন—যা আত্মা ফুঁক দেওয়ার আগে একটি মানবদেহ গঠনের বিভিন্ন ধাপ নির্দেশ করে।

এবার আমরা পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতে ফিরে যাই যেখানে বলা হয়েছে:

مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির সময় আমি তাদের উপস্থিত রাখিনি এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়েও নয়, আর আমি বিভ্রান্তকারীদের নিজের সাহায্যকারী বানাইনি।" (সূরা কাহাফ- ৫১)

এখানে 'মুদিল' (مضل / বিভ্রান্তকারী) শব্দের অর্থ কী? বিভ্রান্তকারী শব্দের অর্থ হলো—সেখানে একটি প্রতিষ্ঠিত 'সত্য' বা 'হক' আছে, আর এক ব্যক্তি আমাকে সেই সত্য থেকে দূরে সরিয়ে তার উল্টো বা মিথ্যা কিছু দিতে চায়; এটাই হলো বিভ্রান্তি বা গোমরাহী।

সুতরাং আল্লাহর বাণী: "আর আমি বিভ্রান্তকারীদের নিজের সাহায্যকারী বানাইনি"—এর অর্থ হলো সৃষ্টির সময়ে আমি এই বিভ্রান্তকারীদের কোনো সাহায্য, পরামর্শ বা উপদেশ নিইনি। যদি আমি তাদের সাহায্য নিতাম এবং তারা এসে তোমাদের বলত কীভাবে

আকাশ-পৃথিবী ও তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তবে তাদের কথা বিশ্বাস করার একটা অজুহাত তোমাদের থাকত। কিন্তু যেহেতু তারা সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল না এবং আমি তাদের সাহায্যও নিইনি, তাই তারা তোমাদের যা বলছে তা অবাস্তব এবং মিথ্যা; তা স্রেফ বিভ্রান্তি।

আর এটিই হলো কুরআনের অন্যতম একটি বড় মু'জিযা। আল্লাহ্ আমাদের আগে থেকেই বলে দিয়েছেন যে, পৃথিবীতে কিছু বিভ্রান্তকারী মানুষের আগমন ঘটবে। আর এই বিভ্রান্তকারীরা আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং মানব সৃষ্টির ব্যাপারে তোমাদের সামনে সত্যের বিপরীত কথা বলার চেষ্টা করবে।

আল্লাহ বলছেন, তোমরা তাদের বিশ্বাস করো না, কারণ সৃষ্টির মুহূর্তে আমি তাদের সাহায্য নিইনি এবং তারা তখন উপস্থিতই ছিল না।

এখন একটু ভেবে দেখুন, যদি পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ না আসত যারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তবে আমরা বলতাম কুরআনের কথা তো মিলল না—কোথায় সেই বিভ্রান্তকারীরা? আবার যদি বিভ্রান্তকারীরা আসত কিন্তু তারা আকাশ-পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টি ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলত, তখনও আমরা বলতাম কুরআনের কথা ঠিক নয়; কারণ বিভ্রান্তকারীরা এসেছে ঠিকই কিন্তু তারা তো সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে কথা বলছে না!

কিন্তু যেহেতু সেই বিভ্রান্তকারীরা ঠিকই দুনিয়ায় এসেছে এবং তারা হুবহু আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং মানুষের সৃষ্টি নিয়েই কথা বলেছে—যেমন 'পদার্থ আগে নাকি আত্মা আগে', 'সমাপতন বা আকস্মিকতা নীতি', 'ডারউইনের বিবর্তনবাদ' ইত্যাদি—তাই তাদের এই আগমন এবং এই নির্দিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলাই প্রমাণ করে যে কুরআনের বাণী একশত ভাগ সত্য!

ইসলামের পথ থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য আসা এই বিভ্রান্তকারীরা আসলে না বুঝেই ইসলামী দাওয়াত এবং কুরআনের এক বিরাট সেবা করে গেছে! তারা তাদের কুফর এবং অবিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে কুরআনের প্রতিটি

আয়াত সত্য! এর চেয়ে বড় অলৌকিকত্ব আর কী হতে পারে? আল্লাহ সেই কাফেরদেরকেই ব্যবহার করছেন যারা তাঁর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায় এবং কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চায়। তারা নিজেরা না বুঝেই স্বয়ং আল্লাহর অস্তিত্ব এবং সেই দ্বীনের সত্যতা প্রমাণ করে দিচ্ছে যা তারা ধ্বংস করতে চেয়েছিল!

চৌদ্দশত বছর আগে নাজিল হওয়া কুরআনে আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে, এমন কিছু লোক আসবে যারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে এবং আকাশ, পৃথিবী ও মানুষের সৃষ্টিতত্ত্বকে তাদের বিভ্রান্তির মূল বিষয় বানাবে। তারা যা কিছু বলবে তার সবই হবে ভিত্তিহীন। আল্লাহ শত শত বা হাজার বছর আগে থেকেই তাদের ভবিষ্যৎ কথাকে মিথ্যা ঘোষণা করে দিয়েছেন।

সুতরাং, এই বিভ্রান্তকারীদের আগমনই কুরআনের সত্যতার এক বড় প্রমাণ। তারা সত্যের বিপরীত কথা বলেছে কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে তা প্রমাণ করতে পারেনি। তারা কেবল একের পর এক থিওরি বা মতবাদ ছুড়ে দিয়েছে—যার একটি অন্যটিকে ধ্বংস করে দেয়। তারা আল্লাহর বিধান ভাঙার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে, আর আমরা তাদের বলছি—"তোমরা তো এই বিধানকে আরও শক্তিশালী করছ! কারণ চৌদ্দশত বছর আগেই আল্লাহ কুরআনে তোমাদের ব্যাপারে আমাদের বলে দিয়েছেন যে তোমরা আসবে এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ও কুরআনকে ধ্বংস করার জন্য এই এই কাজ করবে।" কাফেরদেরকে ব্যবহার করে পৃথিবীতে ঈমানের সত্যতা টিকিয়ে রাখার এই অলৌকিক রূপটি সত্যিই বিস্ময়কর!

মৃত্যু জীবন প্রক্রিয়ার বিপরীত রূপ

অতএব, মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাও আল্লাহ। এটি একটি অদৃশ্যের বিষয় যা আমরা সরাসরি আমাদের স্রষ্টার কাছ থেকে গ্রহণ করি। তবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যখনই কোনো অদৃশ্যের (গায়েবী) বিষয় উপস্থাপন করেন, তখনই তিনি আমাদের বুদ্ধির আলোকে এমন একটি দৃশ্যমান বিষয় সামনে এনে দেন যা আমরা প্রতিদিন অনুভব করি ও দেখি, যা সেই গায়েবী বিষয়টিকে বুঝার পথ সহজ করে দেয়।

যেমন- আল্লাহ আমাকে মাটি, কাদা, দুর্গন্ধময় পচা কাদা এবং শুষ্ক ঠনঠনে কাদা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর তাঁর রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। আমরা যদি সাধারণ মাটির দিকে তাকাই—তাতে পানি মেশালে তা কাদায় পরিণত হয়। তারপর তা রেখে দিলে তার উপাদানগুলোর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তা দুর্গন্ধময় কাদায় রূপ নেয় (যেমনটি মানুষ বিভিন্ন শিল্প তৈরিতে ব্যবহার করে)। এরপর তা শুকিয়ে গেলে ঠনঠনে শক্ত রূপ নেয়। এগুলো হলো মানবদেহ গঠনের বিভিন্ন পর্যায়। মানুষের বেঁচে থাকার মূল উপাদানগুলো আসে কোথা থেকে? মাটি থেকে, কাদা থেকে। এই উর্বর ভূত্বকই আমাদের বেঁচে থাকার সমস্ত উপাদান সরবরাহ করে। সুতরাং, যে উপাদান থেকে আমি সৃষ্টি হয়েছি, তা বিকশিত করার উপাদানও একই উৎস থেকে আসে—আর তা হলো মাটি।

বিজ্ঞানীরা মানুষের দেহ বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, এটি মূলত ১৬টি উপাদান দিয়ে গঠিত; যার প্রথমটি হলো অক্সিজেন এবং শেষটি হলো ম্যাঙ্গানিজ। আর আমাদের পৃথিবীর উর্বর মাটির স্তরও ঠিক এই একই উপাদানগুলো দিয়েই গঠিত! সুতরাং উর্বর মাটির উপাদান আর মানুষের দেহের উপাদান হুবহু এক! এটি একটি বড় অলৌকিকত্ব। আর বিজ্ঞানীদের এই ল্যাবরেটরি পরীক্ষা কিন্তু কুরআনকে সত্য বা মিথ্যা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ছিল না, এটি ছিল স্রেফ জাগতিক বিজ্ঞানের একটি গবেষণা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মৃত্যুকে মানব সৃষ্টির একটি বড় প্রমাণ বানিয়েছেন। মৃত্যু হলো জীবনের বিপরীত বা তার ভাঙন রূপ। অর্থাৎ, একটি জীবন বিদ্যমান আছে এবং

মৃত্যুর মাধ্যমে তার অবসান ঘটছে। যেকোনো জিনিস ভাঙার নিয়ম হলো- তা গড়ার বিপরীত দিক থেকে শুরু হয়।

যেমন- আমরা যদি একটি বহুতল ভবন বানাতে চাই, তবে প্রথম তলা থেকে শুরু করি। কিন্তু যখন তা ভাঙতে চাই, তখন শেষ তলা বা ছাদ থেকে ভাঙা শুরু করি। আমি যদি কোনো গন্তব্যে পৌঁছে আবার ফিরে আসতে চাই, তবে ফেরার যাত্রাটা শুরু হয় আমার পৌঁছানো শেষ বিন্দুটি থেকে; ফেরার পথে সেটাই আমার প্রথম পদক্ষেপ।

আমরা জীবন সৃষ্টির মুহূর্তটি দেখিনি, কারণ সৃষ্টির সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু আমরা প্রতিদিন চোখের সামনে মৃত্যু দেখছি। যেহেতু মৃত্যু জীবনের বিপরীত প্রক্রিয়া, তাই এটি সৃষ্টির ঠিক উল্টো নিয়মে ঘটে। মৃত্যুর সময় মানুষের শরীরে প্রথম যে ঘটনাটি ঘটে তা হলো—রূহ বা আত্মা বের হয়ে যায়। আর এই রূহ ছিল মানুষের শরীরে প্রবেশ করা সবার শেষ উপাদান। সুতরাং, সবার শেষে যা প্রবেশ করেছিল, তা-ই সবার আগে বের হয়ে যায়।

এরপর শরীর সৃষ্টির বিপরীত ধাপগুলো শুরু হয়: লাশটি শক্ত হয়ে যায় (এটিই হলো সেই শক্ত কাদার রূপ/صلصال)। তারপর তা পচে গিয়ে দুর্গন্ধ ছড়ায় (এটিই হলো সেই দুর্গন্ধময় কাদা/حمأ مسنون)। এরপর শরীর থেকে পানি বা তরল বাষ্প হয়ে যায় এবং কাদাটি আবার সাধারণ মাটিতে পরিণত হয়ে পৃথিবীর সাথে মিশে যায়।

অতএব, ধ্বংসের যে পর্যায়গুলো আমরা প্রতিদিন চোখের সামনে দেখছি, তা সৃষ্টির পর্যায়গুলোর ঠিক বিপরীত রূপ। সুতরাং মানবদেহের মূল উপাদান এবং সৃষ্টির প্রক্রিয়া যে সত্য—তা আমাদের চোখের সামনে ঘটে যাওয়া জীবনের ভাঙন অর্থাৎ মৃত্যুর প্রক্রিয়াই প্রমাণ করে দেয়।

আরেকটি বিষয় হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন:

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

"এবং আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছি।" (সূরা হিজর-২৯)

'ফুঁ দেওয়া' বা 'نفخ' শব্দের অর্থ হলো শ্বাস বা বাতাস দেওয়া। এর মানে হলো ফুঁ দাতার কাছ থেকে একটি শ্বাস বা বাতাস ফুঁ দেওয়া বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করল এবং জীবন শুরু হলো। আর জীবন শেষ হয় কীভাবে? এই শ্বাসটি বের হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে! কোনো মানুষ মারা গেছে কি না তা নিয়ে যদি আপনার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে, তবে শুধু এইটুকু দেখাই যথেষ্ট যে—সে শ্বাস নিচ্ছে কি না। যদি সে শ্বাস না নেয়, তবে আপনি নিশ্চিত হয়ে যান যে সে মারা গেছে। সুতরাং শরীরে জীবনের প্রবেশ ঘটেছিল এই শ্বাসের মাধ্যমে—যা আল্লাহর এই বাণীর সত্যতা প্রমাণ করে:

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

"এবং আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছি।" (সূরা হিজর-২৯)

আর জীবন চলে যাওয়াও হলো এই শ্বাসেরই বের হয়ে যাওয়া। পুরো বিষয়টি ঠিক তেমনই বাস্তব যেমনটি আল্লাহ বলেছেন।

কুরআন ও আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ব

আমরা যদি আরও বড় অলৌকিকত্ব দেখতে চাই, তবে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত ভ্রূণতত্ত্ব (**Embryology**) সম্পর্কে কুরআন কী বলেছে। মায়ের জরায়ুতে একটি শিশুর তৈরি হওয়ার পর্যায়গুলো নিয়ে কুরআনের আগে, কুরআনের যুগে বা তার কিছুকাল পরেও কি কোনো মানুষ কথা বলেছিল? কখনোই নয়! এই বিষয়ে প্রথম কথা বলেছে পবিত্র কুরআন। এটি আমাদের এমন এক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দিয়েছে যা আমাদের নিজেদের চোখের আড়ালে ঘটে।

কারণ, আমার নিজের সৃষ্টি কেমন করে হয়েছিল তা তো আমার কাছে অদৃশ্য! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর কুরআনে ভ্রূণ গঠনের এই পর্যায়গুলো যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা তাঁর মহানত্ব, ক্ষমতা এবং অসীম জ্ঞানের এক জীবন্ত নিদর্শন।

ভ্রূণের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا

"...অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু (**نطفة**) রূপে এক নিরাপদ আধারে (জরায়ুতে) স্থাপন করেছি। তারপর আমি শুক্রবিন্দুকে আলাকায় (**علقة** / জমে থাকা রক্তপিণ্ড বা ঝুলে থাকা জোকের মতো রূপ) পরিণত করি, অতঃপর আলাকাকে মুদগায় (**مضغة** / চিবানো মাংসপিণ্ডের মতো রূপ) পরিবর্তন করি, তারপর মুদগাকে হাড়ে (**عظاما**) পরিণত করি এবং শেষে হাড়কে মাংস (**لحما**) দ্বারা আবৃত করি।" (সূরা মুমিনূন-১৪)

ভ্রূণতত্ত্বের এই নিখুঁত জ্ঞান মানুষ মাত্র সেদিনের আধুনিক যুগে এসে জানতে পেরেছে। অথচ কুরআন যেমনটি আমি বলেছি—এমন এক বাণী যা কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থেকে তিলাওয়াত করা হবে। এর কোনো শব্দ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। এর

মানে হলো, কুরআন এখানে যে তথ্য দিয়েছে তা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত হুবহু একই থাকবে। যখন কুরআন এই কথা ঘোষণা করল, তখন সে যেন কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সমস্ত বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদেরকে এক বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল!

কুরআন বিজ্ঞানীদের বলছে—মায়ের পেটে ভ্রূণের গঠন ঠিক এভাবেই হয় এবং আমি তোমাদের এর প্রতিটি ধাপ বিস্তারিত বলে দিলাম। এই কুরআন নাজিল হওয়ার সময় পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো মানুষ এই দৃশ্য দেখেনি, এমনকি নাজিল হওয়ার শত শত বছর পরেও কেউ তা জানতে পারেনি। কিন্তু আমি এটি আগে থেকেই লিপিবদ্ধ করে রাখলাম, যাতে ভবিষ্যতে যখন আমি তোমাদের এমন প্রযুক্তি ও জ্ঞান দেব যা দিয়ে তোমরা জরায়ুর ভেতরের ভ্রূণের পর্যায়গুলো দেখতে পাবে, তখন তোমরা যেন বুঝতে পারো যে—যিনি এই কথা বলেছিলেন তিনিই এই মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা!

কারণ কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে যুগের পর যুগ ধরে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে এই কথা বলা এবং সময়ের সমস্ত পর্দা ভেদ করে এমন এক সত্য বর্ণনা করা কখনো সম্ভব নয়—যা তৎকালীন মানবজাতি কল্পনাই করতে পারত না; যদি না তিনি স্বয়ং আল্লাহ হতেন! নতুবা একজন মানুষ, সে যতই জ্ঞানী হোক না কেন, কীভাবে এই সাহস পেতে পারে যে তার বলা কথার বিরুদ্ধে আগামী শত বা হাজার বছরেও কোনো ভুল প্রমাণিত হবে না?

এই বাণী যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে না হতো এবং এতে যদি পূর্ণ সুনিশ্চিত বিশ্বাস না থাকত, তবে কুরআন নিজেই নিজেকে ধ্বংস করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার কাফেরদের হাতে তুলে দিত। কাফেরদের জন্য শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট হতো যে, "দেখো, কুরআন ভ্রূণ সম্পর্কে এই কথা বলেছে, অথচ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে তা ভুল!" দ্বীনের মূল ভিত্তি উপড়ে ফেলার জন্য কাফেরদের কাছে এর চেয়ে বড় কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন হতো না।

কিন্তু যিনি এই ভ্রূণতত্ত্বের পর্দা উন্মোচন করেছেন, তিনি শতভাগ নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর কথাই পরম সত্য; এবং বিজ্ঞানের উন্নতি যতই হোক না কেন, তা কখনো আল্লাহর এই বাণীকে ভুল প্রমাণ করতে পারবে না। ভ্রূণতত্ত্বের আধুনিকতম গবেষণাগুলো চৌদ্দশত বছর আগে কুরআনে বলা প্রতিটি ধাপের সত্যতা হুবহু প্রমাণ করেছে এবং এর একটি

সাধারণ ডিটেইলেও কোনো অমিল খুঁজে পায়নি! অথচ এটি ছিল সম্পূর্ণ এক অদৃশ্যের বিষয়, যা নিয়ে কুরআনের আগে কোনো মানুষ একটি কথাও বলেনি। তা সত্ত্বেও কুরআন তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছে এবং এর প্রতিটি পর্যায় সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে, আর আধুনিক বিজ্ঞান এসে সেই পরম সত্যেরই সাক্ষ্য দিচ্ছে। অতএব, এটি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই যে—কুরআনের বক্তা স্বয়ং আল্লাহ; কারণ একমাত্র আল্লাহই সর্বজ্ঞ এবং সবকিছুর প্রকৃত রহস্য জানেন।

দুনিয়াতে আল্লাহর আজব নিদর্শনসমূহ

এর পর আমি এমন কিছু বিষয়ের ওপর দিয়ে খুব দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাব, যা আল্লাহর কুদরতের জীবন্ত প্রমাণ। কারণ এই পৃথিবীতে আল্লাহর নিদর্শন অগণিত, আর তার প্রতিটিই কুরআনের অলৌকিকত্বের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

"যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে গলে যাবে, তখনই আমি তার জায়গায় অন্য চামড়া বদলে দেব, যাতে তারা শাস্তির তীব্রতা আস্বাদন করতে পারে।" (সূরা নিসা-৫৬)

এই আয়াতটি কিয়ামতের দিন কাফেরদের শাস্তি ভোগ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ আমাদের জানাচ্ছেন যে, আখিরাতে এই আজাব অবিরাম চলতে থাকবে।

কিছুদিন আগ পর্যন্তও চিকিৎসা বিজ্ঞান ও মানুষের ধারণা ছিল যে, মানুষের অনুভূতির কেন্দ্র মূলত মস্তিস্কে (Brain) অবস্থিত এবং চামড়া বা ত্বকে অনুভূতির কোনো কেন্দ্র নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে তো এই বিষয়ে কারও বিন্দুমাত্র ধারণাই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এসে বললেন:

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ

"যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে গলে যাবে, তখনই আমি তার জায়গায় অন্য চামড়া বদলে দেব, যাতে তারা শাস্তির তীব্রতা আস্বাদন করতে পারে।" (সূরা নিসা-৫৬)

এখানে আজাব বা শাস্তির সাথে সরাসরি চামড়ার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে; অর্থাৎ কষ্টের অনুভূতিটা চামড়া থেকেই আসে। আর আজ আধুনিক বিজ্ঞান অবশেষে আবিষ্কার

করেছে যে, ব্যথার অনুভূতির কেন্দ্রগুলো (Pain Receptors) আসলে মানুষের চামড়াতেই অবস্থিত! আর এই চামড়াই মূলত ব্যথার তীব্রতা অনুভব করায়।

আমরা যদি কুরআনের দিকে তাকাই, তবে দেখব এটিই সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম কিতাব যা আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে ঘোষণা করেছিল যে, পরমাণু বা অণুর (الذرة) চেয়েও ছোট কোনো কণা রয়েছে! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে।" (সুরা যিলযাল ৭-৮)

কারণ অণু বা পরমাণু হলো দুনিয়ার সবচেয়ে সূক্ষ্মতম পরিমাপ। এরপর আল্লাহ্ অন্য একটি আয়াতে এই অণুর চেয়েও ছোট কণার কথা উল্লেখ করে বলেন:

وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

"এবং এর চেয়ে ছোট কিংবা বড় এমন কিছু নেই, যা একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।" (সূরা ইউনূস-৬১)

এর মানে দাঁড়ায়, অণুর চেয়েও ক্ষুদ্রতর কিছু রয়েছে (যেমন আজকের ইলেকট্রন, প্রোটন বা সাব-অ্যাটমিক পার্টিকেল) এবং সেই ক্ষুদ্র জিনিসটিও আল্লাহর কাছে একটি কিতাবে সুনির্দিষ্টভাবে সংরক্ষিত ও লিখিত আছে।

এরপর আল্লাহ্ বলেন:

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ

"অতএব, আমি পূর্বাচল ও পশ্চিমাঞ্চলসমূহের রবের কসম খাচ্ছি।" (সুরা মাআরিজ- ৪০)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে মানুষ সূর্য সম্পর্কে কেবল এইটুকুই জানত যে, সূর্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ওঠে এবং অন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে অস্ত যায়।

তখনকার মানুষ বলত, সূর্য অমুক পাহাড়ের দিক থেকে উদিত হয় আর অমুক গাছের দিকে গিয়ে অস্ত যায়। কিন্তু আজ আমরা জানি, প্রতিটি দেশেরই আলাদা আলাদা উদয়স্থল (মশরিক) ও অস্তাচল (মাগরিব) রয়েছে। সূর্য যখন আমার এখানে পাহাড়ের পাশ থেকে উঠছে, তার ঠিক কয়েক মিনিট পরেই অন্য একটি দেশে উঠছে। তার কয়েক মিনিট পর তৃতীয় একটি দেশে এবং তারও কয়েক মিনিট পর চতুর্থ আরেকটি দেশে উদিত হচ্ছে। একইভাবে সূর্য যখন এক জায়গায় অস্ত যাচ্ছে, তার কয়েক মিনিট পর আমার দেশে অস্ত যায়, তার কয়েক মিনিট পর পার্শ্ববর্তী অন্য দেশে অস্ত যায়। এর মানে হলো সূর্যের বহু উদয়স্থল ও বহু অস্তাচল রয়েছে।

নামাজের বিষয়টাই ধরুন না! এই পৃথিবীতে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার প্রতিটি সেকেন্ডে অবিরাম নামাজ ও আল্লাহর ইবাদত চলছে। জোহরের ওয়াক্ত যখন আমার এখানে শুরু হচ্ছে, তার কয়েক মিনিট পর অন্য শহরে হচ্ছে, তার কয়েক মিনিট পর তৃতীয় আরেকটি শহরে হচ্ছে। এভাবে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, বাকি অর্ধেক মানুষ তখন আল্লাহর তাসবীহ পাঠে মগ্ন থাকে। কেউ যখন ফজরের নামাজ পড়ছে, ঠিক একই মুহূর্তে অন্য কেউ জোহরের নামাজ পড়ছে, একই মুহূর্তে অন্য দেশে কেউ আসরের নামাজ পড়ছে এবং ঠিক একই সময়ে অন্য কোথাও কেউ এশার নামাজ পড়ছে!

যেমন- মিশরের কায়রোতে যখন নামাজের সময় হয়, তার ঠিক দুই মিনিট পর বানহা শহরে সময় হয়, তার দুই মিনিট পর দামানহুরে, তার দুই মিনিট পর আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং তার দুই বা তিন মিনিট পর অন্য কোনো দেশে সময় হয়ে যায়। এভাবে পুরো

পৃথিবীর বুকে এমন একটি সেকেন্ডও পার হয় না, যাতে আল্লাহর জিকির বা স্মরণ বন্ধ থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের আরও একটি চমৎকার বিষয় দেখিয়েছেন। তিনি এমন এক শৈলীতে বিষয়টির সমাধান করেছেন যা কুরআন নাজিলের সমসাময়িক মানুষদের বুদ্ধির সাথে যেমন খাপ খায়, তেমনি অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তাভাবনার সাথেও পুরোপুরি মিলে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

"এবং তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য।"(সূরা নাহল- ৮)

আল্লাহ এখানে তাঁর নেয়ামতের কথা বলতে গিয়ে মানুষের চলাচলের সুবিধার জন্য যা সৃষ্টি করেছেন তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু এটিই কি যাতায়াত ব্যবস্থার শেষ সীমানা? আমি যদি কুরআন নাজিলের সেই প্রাচীন যুগের মানুষের মতো করে চিন্তা করতাম, তবে বলতাম যে হ্যাঁ, এটিই যাতায়াতের শেষ মাধ্যম। কিন্তু আল্লাহ তো আগে থেকেই জানতেন যে মানুষ একসময় গাড়ি, রকেট এবং উড়োজাহাজ তৈরি করবে এবং আরোহণের জন্য ব্যবহার করবে! তিনি জানতেন যে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতি প্রজন্মের যাতায়াতের মাধ্যম বদলে যাবে।

এখন তখনকার মানুষের বুদ্ধির অতীত কোনো কথা না বলে (যা বললে হয়তো তারা উল্টো খেই হারিয়ে ফেলত এবং তাদের মন থেকে ঈমান চলে যেত), কীভাবে আল্লাহ এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে কুরআনে লিপিবদ্ধ করলেন?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ঠিক সেই আয়াতের শেষেই যুক্ত করে দিলেন:

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"...এবং তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করেন যা তোমরা জানো না।" (সূরা নাহল- ৮)

কুরআনের এই ভাষা ও অলৌকিকত্ব কতটা অতুলনীয় ও চমৎকার তা কি দেখতে পাচ্ছেন? এটি আল্লাহর অসীম জ্ঞানকে যেমন লিপিবদ্ধ করে রেখেছে, তেমনি কুরআন নাজিলের সমসাময়িক যুগের মানুষের কাছে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিকে একটি রহস্য বা গায়েব হিসেবে গোপন রেখেছে।

"এবং তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করেন যা তোমরা জানো না"—এর অর্থ হলো, আমি এখন যাতায়াতের জন্য যেসব প্রাণীর কথা উল্লেখ করলাম, এগুলোই শেষ নয়।

আল্লাহ যেন তৎকালীন মানুষদের বলছেন, "আপাতত এগুলোই তোমাদের যাতায়াতের মাধ্যম। কিন্তু আমি তোমাদের অনাগত প্রজন্মের জন্য এমন সব মাধ্যম সৃষ্টি করব যা তোমরা আজ কল্পনাও করতে পারছ না। আবার তার পরের প্রজন্মের জন্য এমন কিছু সৃষ্টি করব যা তার আগের প্রজন্ম জানত না।" পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এভাবেই একের পর এক আবিষ্কার চলতে থাকবে। এভাবে কুরআন ভবিষ্যতের এই প্রযুক্তিগত বিবর্তনকে চমৎকারভাবে ধারণ করেছে, অথচ তার ভাষাটি সেই প্রাচীন যুগের মানুষের বোঝার স্তরেই বজায় রেখেছে।

এরপর সমাজ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের দিকে তাকানো যাক। একসময় পুরো দুনিয়া জুড়েই নারীদের দোষ দেওয়া হতো যে পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার পেছনে তাদেরই ভূমিকা রয়েছে। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, ছেলে বা মেয়ে সন্তান জন্ম নেওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হয় পুরুষের শুক্রাণু (نطفة) থেকে, এতে নারীর কোনো হাত নেই। অবশেষে আধুনিক বিজ্ঞান এসে এই মহাজাগতিক সত্যটি আবিষ্কার করেছে! বিজ্ঞান আজ ঘোষণা করেছে যে, মানবজাতির দুটি প্রধান উপাদান—পুরুষ ও নারী হওয়ার হরমোন বা ক্রোমোজোম—উভয়ই

পুরুষের মধ্যে একসাথে বিদ্যমান থাকে। সন্তান ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে, তা নির্ধারণের মূল চাবিকাঠি আসে পুরুষের কাছ থেকে, নারীর এতে কোনো ভূমিকা নেই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে, যা তারা পাশ কাটিয়ে চলে যায় অথচ সেগুলোর প্রতি তারা উদাসীন।" (সূরা ইউসুফ- ১০৫)

এর অর্থ হলো, আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ এমন বহু বিস্ময়কর জিনিস সৃষ্টি করে রেখেছেন যা মানুষের গভীর মনোযোগ ও গবেষণা দাবি রাখে। কিন্তু মানুষ সেদিকে চোখ মেলে তাকায় না। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা তাঁর এই নিদর্শনগুলো নিয়ে গভীরভাবে ভাবি এবং মহাবিশ্বের রহস্যগুলো উন্মোচনে আমাদের মেধা ও বুদ্ধিকে কাজে লাগাই।

আল কুরআন ও বিজ্ঞান

কুরআনের অলৌকিকত্ব বা ই'জাজ (الاعجاز) হলো, এটি এমন এমন সব শব্দ ব্যবহার করে যা তার উদ্দেশ্যকে নিখুঁতভাবে প্রকাশ করে এবং এর মর্মার্থের সাথে মহাবিশ্বের কোনো উপাদানের বিন্দুমাত্র সংঘাত ঘটে না। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا

"এবং আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি।" (সূরা হিজর-১৯)

এই বাণীটি সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে মানুষের চোখের দেখা বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়—তা হলো গণ মানুষের কাছে ভূমিকে সমতল মনে হয়। কিন্তু একই সাথে এটি পৃথিবীর গোলাকার (كروية الارض) হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ!

অনুরূপভাবে, পাহাড়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে যখন বলা হয়েছে যে সেগুলো মেঘমালার মতো চলে বা ভেসে বেড়ায়, তখন তা আমাদের নিশ্চিত করে যে পাহাড়গুলো নিজের শক্তিতে নড়াচড়া করে না; বরং পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির সাথে সাথে সেগুলোও ঘুরছে। ঠিক যেমন মেঘ নিজের শক্তিতে চলে না, তাকে চালানোর জন্য বাতাসের ধাক্কার প্রয়োজন হয়।

আবার আল্লাহ্ যখন বলেন:

وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

"এবং রাত দিনের অগ্রগামী হতে পারে না", (সূরা ইয়াসিন- ৪০)

তখন তিনি এটিই নাকচ করছেন যে দিন রাতের আগে চলে যাবে কিংবা রাত দিনের আগে চলে যাবে। এর মানে হলো, রাত ও দিন পৃথিবীর বুকে একই সাথে যুগপৎভাবে

বিদ্যমান আছে, তাদের মধ্যে কোনো আগে-পরের প্রতিযোগিতা নেই। আর কুরআন যখন পরমাণু বা অণু (الذرة) নিয়ে কথা বলে, তখন পৃথিবীবাসী জানার অনেক আগেই সে অণুর চেয়েও ক্ষুদ্রতর কণার কথা উল্লেখ করে।

যখন কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, তখন এটি একক কোনো অলৌকিকত্ব নিয়ে আসেনি, বরং এর একাধিক মু'জিযা ছিল। এটি প্রথমত আরবদেরকে তাদের ভাষাশৈলী ও অলৌকিক অলংকারশাস্ত্র (بلاغة) দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিল। এরপর এটি অদৃশ্যের তিনটি প্রাচীর বা পর্দা (حواجز الغيب الثلاثة)-কে ভেঙে চুরমার করে দেয়:

১. এটি **অতীতের পর্দা** ছিঁড়ে ফেলে আমাদের সামনে বিগত নবী-রাসূলদের ইতিহাস এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ঘটনাবলী হুবহু ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে এবং এ নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।
২. এটি **স্থানের পর্দা** ছিন্ন করে দিয়েছে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত কাফেরদের অন্তরে কী গভীর ষড়যন্ত্র চলছে, তারা গোপনে কী ফন্দি আঁটছে—তা অবিকল উন্মোচন করে দিয়েছে। তাদের ঠোঁট নড়ার আগেই তাদের মনের খবর কুরআন বলে দিয়েছে, অথচ তাদের একজনও এই সাহস দেখাতে পারেনি যে সে দাঁড়িয়ে বলবে—"না, আমার মনে তো এই চিন্তা আসেনি!"
৩. এরপর এটি ভেঙে দেয় **নিকট ভবিষ্যতের পর্দা**।

কুরআন এমন সব ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যা কয়েক মাস বা কয়েক বছর পর হুবহু ঘটেছিল এবং সেগুলোতেও চ্যালেঞ্জ ছিল। কুরআন যা যা জানিয়েছিল, তার সবগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। এই বিষয়গুলোই আমি আগের অধ্যায়ে বিস্তারিত উদাহরণসহ আলোচনা করেছি।

এরপর কুরআন **দূর ভবিষ্যতের পর্দা** উন্মোচন করল, যাতে অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এর অলৌকিক রূপ দেখে কুরআনকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারে এবং এর বক্তা স্বয়ং আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়তে পারে।

তবে কুরআন এমন এক যুগে নাজিল হয়েছিল, যখন ভবিষ্যতের এই বৈজ্ঞানিক অলৌকিকত্বগুলো যদি একদম ভেঙে ভেঙে বিস্তারিত বলা হতো, তবে তখনকার অনেক মুমিন হয়তো বিভ্রান্ত হয়ে কাফের হয়ে যেত এবং অন্যেরা দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত। কারণ সেই কথাগুলো তখনকার মানুষের বুদ্ধির সীমার চেয়ে অনেক ওপরে ছিল।

তাই মুমিনদের ঈমান যেন নষ্ট না হয় এবং কুরআনের অলৌকিকত্বও যেন কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকে, সেজন্য কুরআন বৈজ্ঞানিক থিওরিগুলোর চূড়ান্ত রূপ বা মহাবিশ্বের অমোঘ নিয়মগুলোকে এক চূড়ান্ত বিন্দুতে এনে পেশ করেছে। তখনকার মুমিনরা যখন এগুলো তিলাওয়াত করত, তখন তারা এর ওপর দিয়ে সাধারণভাবেই পার হয়ে যেত, এর ভেতরের আসল বৈজ্ঞানিক গভীরতা বা রহস্যের দিকে তাদের নজর যেত না। কিন্তু পরবর্তীতে যখন এগুলো অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে পেশ করা হলো, তখন তারা এর ভেতরের অলৌকিক বিজ্ঞান বুঝতে পারল। তারা আজ বলতে বাধ্য হচ্ছে —"হাজার বছর আগে বেঁচে থাকা কোনো মানুষের পক্ষে এই কথা বলা অসম্ভব! এই কুরআন নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সত্য বাণী এবং এর বক্তা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ।"

এখানে একটি বিষয় বাকি থাকে—এই বৈজ্ঞানিক গভীরতা কি দ্বীনের বিধিবিধান বা আহকামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? উত্তর হলো: না। দ্বীনের হালাল-হারাম ও আদেশ-নিষেধের বিধানগুলো (যেমন- এটা করো। ওটা করো না) একদম পূর্ণাঙ্গ, স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে নাজিল হয়েছে। এতে কোনো অস্পষ্টতা, সংযোজন, পরিবর্তন বা রহস্যময়তা নেই। আল্লাহর এই জীবনবিধান সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ, যা হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববী দ্বারা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেই এর চূড়ান্ত ব্যাখ্যা সম্পন্ন হয়েছে। ফলে আল্লাহর ইবাদত করতে চাওয়া এবং আল্লাহর জমিনে তাঁর আইন মেনে বাঁচতে চাওয়া প্রত্যেকটি মানুষের কাছে বিষয়টি দিবালোকের মতো পরিষ্কার। আদেশ ও নিষেধগুলো রাসুলের যুগেই সম্পূর্ণ ও ব্যাখ্যাকৃত হয়ে গেছে। ফলে হালালও স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট এবং পুরো দ্বীনই একদম সুস্পষ্ট।

কিন্তু আমরা যদি মহাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর অলৌকিক নিদর্শন বা আয়াতগুলোর (آيات الله في الكون) দিকে তাকাই, তবে দেখব রিসালাতের যুগে সেগুলোর কোনো চূড়ান্ত বা শেষ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, যাতে তা মুসলমানদের জন্য একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বাধ্যতামূলক বা সীমাবদ্ধ না হয়ে যায়। কেন এমন করা হলো? কারণ এই আয়াতগুলোর বৈজ্ঞানিক নেয়ামত ও জ্ঞান প্রতিটি প্রজন্মে নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। আর এই আয়াতগুলোর মধ্য থেকেই কিছু নিদর্শন নিয়ে আমরা এখন কথা বলব।

কুরআন আরবদের ভাষার অলৌকিকত্ব দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিল—প্রথমে বলেছিল পুরো কুরআনের মতো কিছু বানিয়ে দেখাতে, তারপর চ্যালেঞ্জ আরও বাড়িয়ে বলেছিল অন্তত একটি সূরা বানিয়ে দেখাতে। কিন্তু পুরো পৃথিবীর মানুষের সাথে তো আর ভাষার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব নয়, কারণ দুনিয়ার ভাষা তো ভিন্ন ভিন্ন। তাহলে পুরো বিশ্বকে কুরআন কী দিয়ে চ্যালেঞ্জ করল? বিজ্ঞান দিয়ে (بالعلم)। আর এই চ্যালেঞ্জটি কিয়ামত পর্যন্ত একদম উন্মুক্ত ও নিরঙ্কুশ থাকল।

কুরআন বলছে—পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত তোমরা সবাই মিলেও কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না। আচ্ছা, তাদের কী সৃষ্টি করার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল? আল্লাহর সৃষ্টির মতো কোনো মহাবিশ্ব বানানোর? না। মহাবিশ্বে থাকা কোটি কোটি সৌরজগতের মতো কোনো একটি সৌরজগৎ বানানোর? না। কোনো সূর্য, চাঁদ বা তারা বানানোর? না। তাহলে অন্তত এই পৃথিবী বা কোনো মানুষ বানানোর চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল কি? তাও নয়!

তাদের চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল সামান্য একটি মাছি (ذباب) সৃষ্টি করার! আল্লাহ যেন বলছেন—"আমি আল্লাহ তোমাদের বলছি, আমি তোমাদের বিজ্ঞান দেব। মহাবিশ্বের দূর-দূরান্তে আমার নিদর্শন দেখাব; কিন্তু তোমরা সবাই মিলেও একটা মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না। এমনকি পৃথিবীর সব যুগের সব বিজ্ঞানী যদি এই এক কাজে একতাবদ্ধ হয়, তবুও নয়।" এভাবে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত পুরো মানবজাতিকে একটি মাছি সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

তিনি বলছেন—আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যে বিজ্ঞানকে উপাস্য বানিয়েছ, যার ওপর তোমরা অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করেছ, সেই বিজ্ঞান এবং তার সমস্ত ধারক-বাহকেরা মিলেও একটা মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদি তারা সবাই একে অপরের সাহায্যকারীও হয়।

এরপরেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন:

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

"খোঁজকারী এবং যাকে খোঁজা হচ্ছে—উভয়ই কতই না দুর্বল!" (সূরা হাজ্জ-৭৩)

এবং তিনি আরও যুক্ত করেন:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

"তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি।" (সূরা আনআম-৯১)

আজকের সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো—মানুষ চাঁদে পৌঁছে গেছে, হয়তো মঙ্গল গ্রহেও পৌঁছে যাবে এবং তার চেয়েও দূরে মহাবিশ্ব অনুসন্ধান করবে; কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা একটা মাছির ডানা তৈরি করতেও সম্পূর্ণ অক্ষম! আল্লাহর অসীম ক্ষমতার তুলনায়, যিনি কোটি কোটি জীব সৃষ্টি করেছেন, এটি কতই না তুচ্ছ ও দুর্বল একটি দাবি!

এই কারণেই আল্লাহ বলেছেন:

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

"খোঁজকারী এবং যাকে খোঁজা হচ্ছে—উভয়ই কতই না দুর্বল!" (সূরা হাজ্জ-৭৩)

এরপর তিনি বলেন:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

"তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয়নি।" (সূরা আনআম-৯১)

অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষমতা তোমাদের মনে আসা সমস্ত সীমানা ও কল্পনার অতীত, তোমরা আল্লাহর কুদরতের প্রকৃত পরিমাপই জানো না।

এরপর আল্লাহ তাঁর কুরআনে জীবনের ধারাবাহিকতা টিকিয়ে রাখার চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। পানি—যা থেকে প্রতিটি জীবন্ত জিনিস সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

"তোমরা যে পানি পান করো, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তা মেঘ থেকে বর্ষণ করো, নাকি আমি বর্ষণকারী?" (সূরা ওয়াক্বিয়া- ৬৯)

এবং তিনি বলেন: "তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।" অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেই তোমাদের কাছে বৃষ্টি পাঠান। আর এই পানি মুষলধারে নেমে এসে পুরো দুনিয়াকে ভিজিয়ে দেয়—মানুষ, পাখি, বন্যপ্রাণী, ফসল এবং প্রতিটি জীবন্ত প্রাণ তা থেকে প্রাণ রস পায়। মানবজাতি তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এই পানির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, অথচ মানুষ নিজে একটি নদী তৈরি করতেও অক্ষম! যদিও পানি তৈরির মূল উপাদানগুলো (হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন) বিজ্ঞানীদের সামনেই মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে এবং পৃথিবীর বিশাল বিশাল মরুভূমি এক ফোঁটা পানির জন্য চাতক পাখির মতো চেয়ে আছে।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের চ্যালেঞ্জ করেছেন মৃত্যু থেকে পালিয়ে বাঁচতে। তিনি বলেন:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

"তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই—এমনকি তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।" (সূরা নিসা- ৭৮)

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা চ্যালেঞ্জ করছেন যে, তোমরা বিজ্ঞানের যতই চরম শিখরে পৌঁছাও না কেন, মৃত্যু থেকে কোনোভাবেই বাঁচতে পারবে না। তোমরা জাগতিক বিজ্ঞানে হয়তো বলো যে, অমুক জীবাণু বা অমুক রোগের কারণে মানুষের মৃত্যু হয় ইত্যাদি। বেশ তো, তবে তোমরা একটি সুরক্ষিত টাওয়ার বা দুর্গ বানাও এবং তার ভেতরে কোনো মানুষকে রাখো। তোমাদের ধারণা ও বিজ্ঞান অনুযায়ী মৃত্যুর কারণ হতে পারে এমন সমস্ত বিপদ থেকে তাকে দূরে রাখো। সে কোনো যুদ্ধে যাবে না, কোনো দুর্ঘটনায় পড়ার মতো রাস্তায় হাঁটবে না, কোনো দূষিত বাতাস শ্বাস নেবে না—বরং সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অক্সিজেন নেবে, আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে জীবাণুমুক্ত খাবার খাবে এবং এক ফোঁটা জীবাণুও নেই এমন বিশুদ্ধ পানি পান করবে।

তার চারপাশের আবহাওয়াকে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রযুক্তি দিয়ে ফিল্টার বা বিশুদ্ধ করে রাখা হলো। এখানে আমরা মৃত্যুর বাহ্যিক সমস্ত কারণকে সেই মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম। কিন্তু এত কিছুর পরও কি সেই মানুষের জন্য অমরত্ব লিখে দেওয়া সম্ভব? বাহ্যিক সব কারণ বন্ধ করার পর কি সে না মরে বেচে থাকবে?

উত্তর হলো—অবশ্যই তা অসম্ভব। কারণ জীবন ও মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর হাতে। বাহ্যিক কারণগুলো নিজে থেকে কিছু করে না, বরং আল্লাহর ইচ্ছাতেই সেগুলো কার্যকর হয়।

এরপর আল্লাহ কুরআনে পুরো বিশ্বকে পাঁচটি অদৃশ্যের বিষয় (خمس مغيبات) দিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছেন:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। জরায়ুতে যা আছে তা তিনিই জানেন, কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন মাটিতে তার মৃত্যু হবে।" (সূরা লুক্বমান- ৩৪)

আল্লাহ এই পাঁচটি গায়েবী বিষয় দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। সুতরাং কুরআন যেমন নাজিলের সময় আরবদের ভাষার দিক থেকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, ঠিক তেমনি এটি পুরো বিশ্ববাসীর জন্য এমন বহু চ্যালেঞ্জ বহন করে এনেছে। এটি মানবজাতিকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে—তোমরা কখনো অমুক বিষয়ে পৌঁছাতে পারবে না, অমুক কাজ করতে পারবে না, অমুক জিনিস সৃষ্টি করতে পারবে না। এই চ্যালেঞ্জগুলো ছিল পুরো মানবজাতির জন্য এবং সব যুগের জন্য।

কুরআন আমাদেরকে মহাবিশ্বের সত্যতা জানায়

পুরো মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করার পর আল্লাহ বলেন:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ

"শীঘ্রই আমি তাদের আমার নিদর্শনাবলী দেখাব মহাবিশ্বের দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যতক্ষণ না তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে এটিই সত্য।" (সূরা হামিম সাজদাহ/ ফুসসিলাত-৫৩)

এখানে 'দিগন্তে' (فِي الافاق) বলার অর্থ হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাদের সামনে মহাবিশ্বের কিছু অলৌকিক নিদর্শন উন্মোচন করবেন যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই কুরআনই সত্য। আর কীভাবে তাদের কাছে এটি স্পষ্ট হবে? তা হলো—মানুষ তাদের মেধা ও বুদ্ধি খাটিয়ে শত শত বা হাজার হাজার বছর পর মহাবিশ্বের যেসব বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করবে, তারা দেখবে কুরআন আগে থেকেই সেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে রেখেছে! আর তখনই তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে এই কুরআনই সত্য; কারণ এর বক্তাও আল্লাহ এবং এই সৃষ্টির স্রষ্টাও আল্লাহ।

এই কারণেই কুরআনে এসেছে যে পৃথিবী গোলাকার এবং এটি আবর্তন করে। এতে এসেছে মানুষের সৃষ্টির রহস্য এবং সে কীভাবে কথা বলতে শিখল তার বিবরণ। এতে এসেছে অণুর চেয়েও ছোট কণার অস্তিত্বের কথা এবং মায়ের জরায়ুতে ভ্রূণের নিখুঁত ও চমৎকার পর্যায়গুলোর বর্ণনা। এতে আরও এসেছে যে রাত ও দিন একই সাথে পৃথিবীর বুকে অবস্থান করে। এছাড়াও এমন আরও অজস্র মহাজাগতিক সত্য এতে রয়েছে যা এখানে সংক্ষেপে বলে শেষ করা যাবে না।

তবে এই বিষয়ে আরও গভীরে যাওয়ার আগে আমাদের 'বিজ্ঞান' বা 'জ্ঞানের' (العلم) প্রকৃত অর্থ সুনির্দিষ্ট করতে হবে। যেকোনো জ্ঞান মূলত দুটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যায়:

প্রথমটি হল- **তাসাউউর** তথা ধারণা বা অনুধাবন এবং দ্বিতীয়টি হল- **তাসদীক** তথা সত্যতা স্বীকার বা প্রমাণ)।

তাসাউউর বা ধারণার অর্থ হলো—আমরা কোনো বিষয় প্রমাণ বা খণ্ডন করার আগে, যে শব্দগুলো দিয়ে আমাদের বক্তব্য সাজাচ্ছি সে শব্দগুলোর অর্থ আমাদের মাথায় স্পষ্ট থাকতে হবে। যেমন 'আকাশ' শব্দটার অর্থ কী, 'পৃথিবী' বলতে কী বোঝায়, কিংবা 'নীল' রঙের অর্থ কী ইত্যাদি। এটিই হলো ধারণা। এর মধ্যে কোনো তুলনামূলক সম্পর্ক বা রায় থাকে না। কিন্তু যখন 'নিসবাত' বা সম্পর্ক আসে—অর্থাৎ আপনি যখন কোনো জিনিসের ওপর অন্য কোনো জিনিসের রায় বা হুকুম দেবেন, তখন তার আগে অবশ্যই সেই শব্দগুলোর ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা (علم التصور) থাকতে হবে।

এরপর আমরা খুব সংক্ষেপে 'তাসদীক' বা প্রমাণের দিকে চলে যাই। আপনি যখন আমার কাছে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের কথা বলবেন, তখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব—এটি কি বাস্তবে ঘটেছে? আপনি যদি বলেন 'হ্যাঁ', তবে আমি জিজ্ঞেস করব—আপনি কি এ ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত? আপনি যদি বলেন 'হ্যাঁ', তবে আমি আবার জিজ্ঞেস করব—আপনি কি এর স্বপক্ষে প্রমাণ বা দলিল দিতে পারবেন? আপনি যদি বলেন 'হ্যাঁ', তবে সেটিই হলো প্রকৃত বিজ্ঞান বা জ্ঞান (**العلم**)।

সুতরাং বিজ্ঞান হলো—বাস্তবে ঘটে যাওয়া এমন একটি অনস্বীকার্য সত্য, যা সুনিশ্চিত এবং যার স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে।

কিন্তু যদি এমন হয় যে, আমি কোনো বিষয়ের ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত, অথচ বাস্তবে তার কোনো অস্তিত্বই নেই—তবে সেটিকে বলা হয় **জাহালাত** তথা অজ্ঞতা বা মূর্খতা।

অর্থাৎ এমন এক বিষয়ে সুনিশ্চিত বিশ্বাস রাখা যা বাস্তবে সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহামারী বা রোগ হলো এই 'জাহালত'। যে মানুষটি কোনো একটি বৈজ্ঞানিক সত্য সম্পর্কে জানে না, তাকে সহজে তা শিখিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আসল বিপদ হলো সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে—যে একটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বা কাল্পনিক বিষয়কে

সত্য বলে মনে গেঁথে নিয়েছে এবং তারপর পুরো দুনিয়া মাথায় তুলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে- সেই কাল্পনিক জিনিসটিই সত্য! আজকের মানবজাতি মূলত এই সমস্যাতেই ভুগছে।

আমরা যখন কুরআন ও বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলি, তখন এখানে 'বিজ্ঞান' বলতে মানুষের সেই জাগতিক জ্ঞানকে বোঝানো হয় যা মহাবিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে মানুষ অর্জন করে; যেমনটি কুরআন বলেছে: "তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটা জানে।"

আমরা অনেক সময় কোনো সাধারণ বৈজ্ঞানিক থিওরিকে চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য বলে দাবি করে বসি, অথচ তা আসলে কোনো প্রমাণিত সত্য নয়। আবার কখনও কুরআনের কোনো আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে সেটাকে কুরআনের অকাট্য সত্য বলে দাবি করি, যা আসলে কুরআনের উদ্দেশ্যই নয়!

এখানে প্রথম ব্যাপারটি হলো- সাধারণ একটা অনুমিত থিওরি বা ধারণাকে চূড়ান্ত বিজ্ঞান বলে দাবি করা। আর দ্বিতীয়টি হলো- কুরআনের ভুল ব্যাখ্যাকে কুরআনের অকাট্য সত্য বলে দাবি করা। যেমন—একজন মানুষ এসে বলল- পৃথিবী সমতল বা বিছানো এবং সে এর সপক্ষে দলিল দিল যে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا

"এবং আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি। (সূরা হিজর-১৯) আয়াতের মধ্যকার একটি শব্দ হচ্ছে- (مددناها)"—যার অর্থ হলো সমতল করা বা বিছিয়ে দেওয়া। সে নিজের যুক্তি অনুযায়ী এটাকে কুরআনের চূড়ান্ত সত্য বলে ধরে নিল।

এমনকি মানুষ যখন বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে গিয়ে নিজের চোখে দেখল যে পৃথিবী আসলে গোলাকার, তখনও এই ব্যক্তি বিজ্ঞানের এই সত্যকে অস্বীকার করে বসল! সে বলতে লাগল—"না, পৃথিবী সমতলই। কুরআন এমনই বলেছে এবং এর বাইরে যা কিছু আছে সবই কুফর!"

আমরা তাকে বলব—"তুমি আসলে কুরআনের প্রকৃত সত্য বুঝতে ভুল করেছ। তুমি যে দলিলটি দিয়েছ তা তোমার দাবিকে সমর্থন করে না, বরং এটি উল্টো তোমার দাবির বিরুদ্ধেই যায়!" কারণ পৃথিবী যদি সমতল বা ছড়ানো হতো, তবে এর আকৃতি কয়েকটা রূপের বাইরে হতো না—হয় এটি চারকোনা (বর্গাকার) হতো, না হয় ত্রিকোণাকার হতো, না হয় আয়তাকার হতো, সমান্তরাল হতো, ট্রাপিজিয়াম হতো কিংবা অসম বাহুবিশিষ্ট কোনো আকৃতির হতো। সংক্ষেপে, গোলাকার আকৃতি ছাড়া পৃথিবীর অন্য যেকোনো জ্যামিতিক আকৃতি আপনি কল্পনা করে নিতে পারেন।

পৃথিবীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তা একটি গোলক

তাহলে পৃথিবী যদি সমতল বা বিছানোই হতো, তবে অবশ্যই তার একটি নির্দিষ্ট পরিসীমা বা সীমানা থাকত। আর আপনি যদি সেই সমতলের শেষ প্রান্তে যেতেন, তবে নিশ্চিতভাবেই তার শেষ প্রান্তে বা কিনারায় গিয়ে পৌঁছাতেন। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন:

(وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا)

অর্থাৎ "এবং আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি।"(সূরা হিজর- ১৯) আর 'আমি বিস্তৃত করেছি' (مددناها)-এর আসল অর্থ হলো—আপনি পৃথিবীর এই গোলকের ওপর যেখানেই যান না কেন, তা আপনার সামনে দিগন্ত বিস্তৃত বা ছড়ানোই মনে হবে।

আপনি যদি উত্তর মেরুতে যান, তবে সেখানেও পৃথিবীকে আপনার সামনে সমতল বা বিস্তৃত দেখতে পাবেন; আপনি যদি দ্রুত দক্ষিণ মেরুতে চলে যান, সেখানেও পৃথিবীকে ছড়ানো দেখতে পাবেন; আবার যদি বিষুবরেখায় (পৃথিবীর মধ্য রেখায়) যান, সেখানেও আপনার সামনে পৃথিবীকে বিস্তৃতই পাবেন। আমরা যেকোনো জায়গায় যাই না কেন, পৃথিবীকে আমাদের সামনে সমতল বা ছড়ানোই দেখি। আর এই ঘটনাটি তখনই ঘটা সম্ভব, যদি পৃথিবী আকৃতিতে গোলাকার হয়! সুতরাং, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا) মূলত পৃথিবীর গোলাকার হওয়ারই এক অকাট্য প্রমাণ।

কিন্তু একজন মানুষ ভুল করে এই শব্দটির অর্থ এমনভাবে করল যে, এটি নাকি পৃথিবী সমতল হওয়ার প্রমাণ! আর সে নিজের মনগড়া এই অর্থকে 'কুরআনের সত্য' বলে প্রচার করতে লাগল। অথচ এটি মোটেও কুরআনের প্রকৃত সত্য নয়। এরপর যখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হলো যে- পৃথিবী আসলে গোলাকার, তখন জাগতিক বিজ্ঞান ও কুরআনের তথ্যের মধ্যে একটি কাল্পনিক বা অবাস্তব সংঘাত তৈরি হলো। আর এখানেই আল্লাহর কিতাবকে খাটো করার পেছনে মানুষের 'জাহালত' বা অজ্ঞতার আসল রূপ প্রকাশ পায়। অথচ এই মানুষগুলো যদি সামান্য একটু গভীরে গিয়ে চিন্তা

করত, তবে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে পৃথিবীর গোলাকার হওয়া এবং এর ঘূর্ণন গতির কথা কুরআনুল কারীমে আগে থেকেই বিদ্যমান রয়েছে; যে বিষয়ে আমরা অন্য এক জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা করব।

অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আরেকটি বাণী লক্ষ্য করা যাক, যেখানে তিনি বলেছেন:

(وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ)

অর্থাৎ "এবং জরায়ুতে যা আছে তা তিনিই জানেন।" (সূরা লুক্বমান- ৩৪)

এখন কোনো একজন মানুষ এসে বলল—এই আয়াতের অর্থ হলো, মায়ের পেটের সন্তানটি ছেলে নাকি মেয়ে, তা কেবল আল্লাহই জানেন। এরপর বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় যখন এমন এক প্রযুক্তি আবিষ্কার হলো যার মাধ্যমে সন্তান জন্ম নেওয়ার আগেই নির্দিষ্ট সময়ে জানা সম্ভব হলো যে সেটি ছেলে নাকি মেয়ে, তখন কিছু মানুষ বলতে শুরু করল—তাহলে তো (وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ) আয়াতটি আর সেই পাঁচটি গায়েবী বিষয়ের (المغيبات الخمس) মধ্যে রইল না, যা আল্লাহ তাঁর নিজের জ্ঞানের জন্য সুনির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন এবং পুরো মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন! আর এখান থেকেই শুরু হলো অমূলক বিতর্ক।

কিন্তু এমন কথা যে বলছে, তাকে মূলত যে প্রশ্নটি করা উচিত ছিল তা হলো: কে আপনাকে বলল যে জরায়ুর সন্তানটি ছেলে নাকি মেয়ে—এটুকুই জানা এই বরকতময় আয়াতের একমাত্র অর্থ? কে এই আয়াতের ‘মা’ (ما / যা কিছু) শব্দটিকে শুধু ‘ছেলে নাকি মেয়ে’—এই সামান্য অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করল? অথচ ব্যাকরণগতভাবে এই 'মা' শব্দটি এসেছে একদম সাধারণ এবং ব্যাপক অর্থে (مطلقة على العموم)।

আপনি নিজে থেকে দাবি করে বসলেন যে ‘মা’ শব্দের অর্থ কেবল ছেলে ও মেয়ে এবং এটাকেই কুরআনের অকাট্য সত্য বলে ধরে নিলেন। অথচ এই ‘মা’ শব্দের তাৎপর্য এর

চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি ও গভীর! সন্তানটি ছেলে নাকি মেয়ে—তা একটি সত্য; কিন্তু সে লম্বা হবে নাকি খাটো হবে—তা আরেকটি সত্য। সে কালো হবে, ফর্সা হবে নাকি বাদামী রঙের হবে—তা তৃতীয় আরেকটি সত্য। সে জীবনে সুখী হবে নাকি হতভাগ্য হবে—তা চতুর্থ সত্য। সে বুদ্ধিমান হবে নাকি ধনী হবে—তা ষষ্ঠ সত্য এবং সে কি সুস্থ থাকবে নাকি অসুস্থ হবে—তা সপ্তম সত্য। এভাবে আমি শত শত, এমনকি হাজার হাজার বাস্তবতার কথা বলে যেতে পারব, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই ছোট্ট **'মা'** (ما / যা কিছু) শব্দটির মাধ্যমে এই আয়াতে প্রকাশ করেছেন।

তাছাড়া বিজ্ঞান আজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে জরায়ুর ভেতরে যেটুকু জানার চেষ্টা করছে, তা এখনো অনুমানের স্তরেই রয়ে গেছে, চূড়ান্ত কোনো নিশ্চয়তায় পৌঁছাতে পারেনি। যেমন ছেলে বা মেয়ে হওয়ার ব্যাপারে শুরুতেই কিন্তু ৫০% সম্ভাবনা বা অনুপাত প্রাকৃতিকভাবে দেওয়াই থাকে। অর্থাৎ আপনি যদি কোনো গর্ভবতী মহিলাকে দেখে এমনিতেই বলে দেন যে—"তার মেয়ে হবে", তবে আপনার এই কথাটি এমনিতেই ৫০% সত্য হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। বিজ্ঞান বড়জোর এই ৫০% সম্ভাবনার ওপর আরও ২০% বা ৩০% নিশ্চয়তা যুক্ত করেছে মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞান কি আমাদের বলতে পারবে সেই অনাগত সন্তানের গায়ের নিখুঁত বিবরণ কী হবে? কিংবা তার এমন কোনো বৈশিষ্ট্য কি নিখুঁতভাবে বলতে পারবে, যার কোনো পূর্ব-নির্ধারিত অনুপাত বা সম্ভাবনা আগে থেকে দেওয়া নেই?

এখানে আমি কিছু বৈজ্ঞানিক থিওরি বা তত্ত্বের কারণে সৃষ্ট শোরগোল নিয়ে সামান্য আলোকপাত করতে চাই। যেমন—যখন তথাকথিত 'টেস্টটিউব বেবি' উৎপাদনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হলো এবং টেস্টটিউবের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুদের নিয়ে চারিদিকে তুমুল আলোচনা শুরু হলো...

...তখন শেষ পর্যন্ত কী হলো? সবকিছুই এক চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। ঠিক একইভাবে কৃত্রিম উপায়ে জীবন্ত কণা বা প্রাণ সৃষ্টির আলোচনাগুলোর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হয়েছে। কুরআন তো মানবজাতিকে সামান্য একটি মাছি সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ দিয়েছে।

আল্লাহ মানুষকে বিজ্ঞান দিয়েছেন যাতে সে চাঁদে পৌঁছাতে পারে, কিন্তু তিনি মানুষকে একটি মাছির ডানাও সৃষ্টি করার জ্ঞান দেননি।

(অনুবাদক-টীকা: বইটি ১৯৭০-এর দশকের শেষভাগে রচিত। এখানে লেখক টেস্ট-টিউব বেবি (IVF) সম্পর্কে সে সময়কার একটি মূল্যায়ন তুলে ধরেছেন। পরবর্তীকালে IVF চিকিৎসা বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত ও সফল পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এছাড়া শায়েখ মুহাম্মদ মুতাওয়াল্লী আশ-শা'রাউয়ী পরবর্তী সময়ে শর্তসাপেক্ষে (স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব শুক্রাণু ও ডিম্বাণু ব্যবহৃত হলে) IVF-এর বৈধতার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।)

কুরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যকার সংঘাত

সুতরাং, কুরআন এবং মহাবিশ্বের বাস্তবতার মধ্যে যদি কোনো সংঘাত দেখা দেয়, তবে তা তখনই ঘটে যখন আমরা মহাবিশ্বের কোনো একটি কাল্পনিক ধারণাকে চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য বলে দাবি করি যা আসলে কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যই নয়; অথবা কুরআনের কোনো ভুল ব্যাখ্যাকে কুরআনের অকাট্য সত্য বলে দাবি করি যা আসলে কুরআনের উদ্দেশ্যই নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে কুরআনের কোনো কথা কখনোই সাংঘর্ষিক হতে পারে না। কারণ, কুরআনের বাণী যার—তিনিও আল্লাহ, আবার এই মহাবিশ্বের চালিকাশক্তি যিনি—তিনিও আল্লাহ।

এই বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পর, আমাদের মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি ছোট বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। যারা বলেন যে কুরআন কোনো বিজ্ঞানের বই (كتاب علم) হিসেবে নাজিল হয়নি, তারা একদম সত্য কথাই বলেন। কারণ, এটি মূলত এমন একটি কিতাব যা আমাকে জীবনের বিধান বা আহকাম শেখাতে এসেছে, এটি আমাকে ভূগোল, রসায়ন বা পদার্থবিদ্যা শেখাতে আসেনি। কিন্তু একই সাথে আমরা যখন বলি যে—কুরআন এমন কিছু অলৌকিক নিদর্শন বা মু'জিযার কথা উল্লেখ করেছে যার অনেকগুলোর কিনারা বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত করতে পারেনি, তবে সেই কথাটিও একইভাবে সত্য।

এই অলৌকিক বিষয়গুলোই হলো মহাবিশ্বের চূড়ান্ত সত্য। কুরআন যদিও আমাকে চিকিৎসাবিজ্ঞান শেখাতে আসেনি, তা সত্ত্বেও এটি এমন কিছু জটিল চিকিৎসাগত বিষয়ের সূক্ষ্ম বিবরণ দেয়, যেখানে পৌঁছাতে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের শত শত বা হাজার হাজার বছর লেগে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, এটি ভূগোলের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে স্পর্শ করেছে যা আমরা হাজার বছর পর এসে জানতে পেরেছি। দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এই কথাটি প্রযোজ্য। অর্থাৎ মহাবিশ্বের মৌলিক যে সত্য ও নিয়মগুলোর ওপর ভিত্তি করে এই সৃষ্টিজগৎ গড়ে উঠেছে কুরআন সেগুলোকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবেই স্পর্শ করেছে—তা আপনি আপনার বিজ্ঞান দিয়ে আজ

আবিষ্কার করতে পারেন কিংবা না-ই পারেন। আসুন, আমরা এই সত্যগুলোর মধ্য থেকে কিছু নিদর্শন পর্যালোচনা করা শুরু করি।

পৃথিবী গোলাকার হওয়া

প্রথম সত্যটি হল- পৃথিবীর গোলাকার হওয়া। আমি বিশ্বাস করি যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে পৃথিবীর কোনো মানুষেরই পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, কিংবা এই জ্ঞান কারো কাছে পৌঁছায়ওনি। আর ঠিক সেই সময়েই কুরআন এসে ঘোষণা করল: (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا) অর্থাৎ "এবং আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি।" এখানে কুরআনের শব্দ চয়নের নিখুঁত অলৌকিকত্ব লক্ষ্য করুন। এটি এমন একটি অনন্য শব্দ বেছে নিয়েছে যা কুরআন নাজিলের যুগের মানুষের চিন্তার সাথে যেমন খাপ খায়, তেমনি অনাগত ভবিষ্যতের শত শত প্রজন্মের বিজ্ঞানের সাথেও হুবহু মিলে যায়। এই 'মাদাদনাহা' (مددناها) শব্দটি একই সাথে দুটি অর্থই প্রকাশ করে।

যখন বলা হচ্ছে "এবং আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি" অর্থাৎ বিছিয়ে দিয়েছি—তখন সমসাময়িক মানুষের মনে কোনো খটকা তৈরি হয় না, কারণ তাদের চোখে পৃথিবী তখন সমতলই মনে হতো। আবার যখন সময়ের আবর্তনে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হলো যে পৃথিবী আসলে গোলাকার, তখন আমরা দেখতে পাই যে এই একই শব্দ পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার নিখুঁত বিবরণ দিতে সবচেয়ে বেশি উপযোগী!

এরপর আল্লাহ তায়ালার এই বাণীটি নিয়ে আমরা একটু ভাবি, যেখানে তিনি বলেছেন: (يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ) অর্থাৎ "তিনি রাতকে দিন দ্বারা এবং দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত বা পেঁচিয়ে দেন।" এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কেন 'ইউকাভভিরু' (يُكَوِّرُ/ গোলাকার বস্তুতে পেঁচানো) শব্দটি ব্যবহার করলেন? কেন তিনি রাত ও দিনকে 'বিছিয়ে দেন' (يبسط) বা এই জাতীয় অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করলেন না—যদি পৃথিবী সমতলই হতো?

আপনি যদি কোনো কাপড়কে একটি গোল বল বা গোলকের চারপাশে পেঁচিয়ে দেন, তবেই আপনি বলতে পারবেন যে আপনি কাপড়টিকে 'কাওয়ারতু' (كورت/গোলাকার

রূপ দিয়েছি) করেছেন; অর্থাৎ কাপড়টি সেই গোলকের আকৃতি ধারণ করেছে। আবার আপনি যদি কাউকে গোল কোনো জিনিস বানাতে বলেন, তবে আপনি তাকে বলবেন —"এটাকে গোল করো (كوره)" অর্থাৎ গোলকের আকৃতি দাও। সুতরাং, আল্লাহর বাণী "তিনি রাতকে দিনের ওপর পেঁচিয়ে দেন"—এর অর্থ হলো, তিনি রাত ও দিনকে পৃথিবীর এই গোলকের চারপাশে পরিবেষ্টিত বা জড়ানো অবস্থায় রেখেছেন। আর কুরআনের অলৌকিকত্ব হলো—এই রাত ও দিন প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর গোলকের চারপাশে একই সাথে পেঁচানো অবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

এখানে আল্লাহ এটি বলেননি যে—তিনি প্রথমে রাতকে গোল করেন এবং পরে দিনকে গোল করেন; বরং তিনি বলেছেন: "তিনি রাতকে দিনের ওপর (عَلَى) পেঁচিয়ে দেন।" আর এখানে 'আলা' (على / ওপর) শব্দটির ব্যবহার আমাদের বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে, যা পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার সাথে কত চমৎকারভাবে মিলে যায়। রাত ও দিন একে অপরের ওপর পেঁচিয়ে থাকার মানে হলো—তারা একই সময়ে পৃথিবীর বুকে যুগপৎভাবে বিদ্যমান রয়েছে। আর এই মহাজাগতিক সত্যটি কুরআন আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছে, যা মানুষের বিজ্ঞান কেবল এই সেদিন আবিষ্কার করতে পেরেছে।

পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার বিষয়টি কুরআন একাধিক জায়গায় স্পর্শ করেছে। কেন? কারণ এটি মহাবিশ্বের একটি অন্যতম প্রধান সত্য।

এরপর আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এই বাণীটি নিয়ে চিন্তা করি:

(وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ)

অর্থাৎ "এবং রাত দিনের অগ্রগামী হতে পারে না।" (সূরা ইয়াসিন- ৪০)

এই বরকতময় আয়াতের অর্থ কী? এর অর্থ হলো, আল্লাহ তখনকার মানুষের মনের একটি প্রচলিত ভুল ধারণার সংশোধন করে দিচ্ছেন। তৎকালীন আরবরা মনে করত যে

দিন রাতের আগে চলে—অর্থাৎ দিন শুরু হয় সূর্যোদয়ের মাধ্যমে এবং শেষ হয় সূর্যাস্তে, আর তার পরেই কেবল রাত আসে। যার মানে দাঁড়ায় দিন রাতের আগে চলে।

তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এসে বললেন—"না, রাত দিনের আগে চলে যেতে পারে না।" এর মাধ্যমে তিনি তাদের সেই ধারণাকে খণ্ডন করে বললেন—না তো দিন রাতের আগে চলে, আর না তো রাত দিনের আগে চলে। আর এটিই ছিল তাদের জন্য পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার এক প্রচ্ছন্ন ঘোষণা।

এর অর্থ হলো, রাত ও দিন পৃথিবীর বুকে একই সময়ে একইসাথে বিদ্যমান রয়েছে। পৃথিবী যদি সমতল বা বিছানো হতো, তবে বিষয়টি কেবল দুটি অবস্থার বাইরে যেত না।
প্রথম অবস্থা: আল্লাহ সূর্যকে সমতল পৃথিবীর মুখোমুখি করে সৃষ্টি করেছেন—এমতাবস্থায় দিন আগে সৃষ্টি হতো এবং পরে যখন আল্লাহ সূর্যকে ডুবিয়ে দিতেন তখন রাত আসত। অথবা

দ্বিতীয় অবস্থা: আল্লাহ সূর্যকে সমতল পৃথিবীর বিপরীত দিকে সৃষ্টি করেছেন—এমতাবস্থায় রাত আগে বিদ্যমান থাকত এবং পরে যখন সূর্য উদিত হতো তখন দিন আসত। সমতল পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই দুটি অবস্থার বাইরে অন্য কিছু হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আল্লাহ যখন এসে বললেন: (وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ) অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণভাবে এটি নাকচ করে দিলেন যে দিন রাতের আগে চলে কিংবা রাত দিনের আগে চলে। অর্থাৎ সৃষ্টির শুরু থেকেই তাদের কেউই একে অপরের আগে-পরে প্রতিযোগিতা করে না।

মহাবিশ্বের আকৃতি ও পরিমাপের নিয়মে এটি কখনোই ঘটা সম্ভব নয়—যদি না পৃথিবী আকৃতিতে গোলাকার বা বৃত্তাকার হয়! কারণ আল্লাহ যখন সূর্য ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, তখন রাত ও দিন একই সাথে যুগপৎভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পৃথিবীর যে অর্ধেক অংশ সূর্যের মুখোমুখি ছিল তা দিনে পরিণত হলো এবং অপর অর্ধেক অংশ রাতে নিমজ্জিত হলো। এরপর যখন পৃথিবী তার নিজের অক্ষের ওপর ঘুরতে শুরু করল, তখন রাত দিনের জায়গায় এবং দিন রাতের জায়গায় চলে এলো। এভাবেই পর্যায়ক্রমে

চলতে লাগল। সুতরাং এই বরকতময় আয়াতটি আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে যে, পৃথিবীকে সৃষ্টির শুরুতেই এই গোলাকার আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে।

কুরআনে পৃথিবীর আবর্তন বা ঘূর্ণন গতি

এরপর আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আসি—তা হলো পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি বা আবর্তন। কোনো মানুষ কি এমন কোনো জায়গার ওপর বসে নিজে সেই জায়গার গতি অনুধাবন করতে পারে—যদি সেই পুরো জায়গাটিই তার ভেতরের সমস্ত কিছু নিয়ে একসাথে ঘুরতে থাকে? আপনি কখনোই বুঝতে পারবেন না যে আপনি গতিশীল আছেন। কেন? কারণ যেকোনো চলমান বস্তুর গতি বুঝতে হলে আপনাকে সর্বদা একটি স্থির বস্তুর সাথে তার তুলনা করতে হবে। কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে তো তুলনা করার মতো কোনো কিছুই স্থির নেই, কারণ পুরো পৃথিবীটাই তার ভেতরের সবকিছু নিয়ে একসাথে ঘুরছে এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠের প্রতিটি স্থানের অবস্থানও পৃথিবীর সাপেক্ষে স্থির রয়েছে।

যেমন—আমরা যদি সম্পূর্ণ বন্ধ একটি ঘরের ভেতরে বসি এবং সেই ঘরটি যদি আমাদের সবাইকে নিয়ে একসাথে ঘুরতে থাকে, আর ঘরের ভেতরের আমাদের অবস্থান যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে আমরা ঘরের এই ঘূর্ণন বিন্দুমাত্র টের পাব না। যতক্ষণ না আমরা একটি জানালা খুলে বাইরের কোনো স্থির খুঁটি বা গাছের সাথে আমাদের গতিকে তুলনা করছি, ততক্ষণ আমরা আমাদের গতি বুঝতে পারব না। এ থেকেই বোঝা যায় যে, কোনো চলমান বস্তুর গতি স্থির বস্তুর সাপেক্ষে পরিমাপ করা ছাড়া চেনা অসম্ভব। আর পৃথিবীর বাইরে গিয়ে কোনো স্থির বস্তুর সাপেক্ষে পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি মেপে তা মানুষের পক্ষে জানা কি সম্ভব ছিল? কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

যেহেতু আমি নিজে এই গতি অনুভব করতে পারছি না, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য বলেন:

(وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ)

অর্থাৎ "এবং তুমি পাহাড়গুলোকে দেখছ, তোমার মনে হচ্ছে সেগুলো স্থির বা জমাটবদ্ধ হয়ে আছে; অথচ সেগুলো মেঘমালার মতো চলে বা ভেসে বেড়ায়।" (সূরা নামল- ৮৮)

এখানে 'তোমার মনে হচ্ছে' (تحسبها) বলার অর্থ হলো—এটি তোমার চোখের ভুল বা ধারণা মাত্র, বাস্তব সত্য নয়। কারণ যে পাহাড়গুলোকে তুমি তোমার সামনে একদম অটল, স্থির ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছ, বাস্তবে সেগুলো তেমন নয়।

আল্লাহ আমাদের বলতে চাচ্ছেন—পৃথিবীর খুঁটি বা পেরেকস্বরূপ যে বিশাল, সুদৃঢ় পাহাড়গুলো তোমার সামনে একদম জমাটবদ্ধ ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যা তুমি নিজে কখনো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারো না বা স্থানচ্যুত করতে পারো না; এই সুউচ্চ পর্বতমালা তোমার চোখের সামনে মেঘমালার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে অথচ তুমি তা টেরই পাচ্ছ না!

কুরআনের এই আয়াত শুনে যখন আপনি চরম বিস্ময়ে ভাববেন—এই পাহাড়গুলো আমার চোখের সামনে এত অটল ও স্থির থাকা সত্ত্বেও কীভাবে মেঘের মতো ভেসে বেড়ায়? তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনাকে বলবেন—"বিস্মিত হয়ো না, এটি তো আল্লাহরই নিপুণ কারিগরি (صُنْعَ اللَّهِ), যিনি প্রতিটি জিনিসকে নিখুঁতভাবে তৈরি করেছেন।"

এখানে যদি কেউ এসে দাবি করে যে—এই ঘটনাটি কিয়ামতের দিন বা আখেরাতে ঘটবে, তবে আমরা তাকে বলব: আখেরাতে তো এই পৃথিবী আর এই রূপের পৃথিবী থাকবে না। সেদিন পাহাড়গুলো ধূলিকণার মতো উড়ে যাবে; যেমনটি আল্লাহর বাণী—

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

"যেদিন এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে রূপান্তরিত করা হবে..." (সূরা ইবরাহীম- ৪৮)

তাছাড়া আখেরাতে কি মানুষের মনে কোনো 'ভ্রম বা ধারণা' (حسبان) থাকবে? কখনই নয়। আখেরাত হলো এমন এক জগত যেখানে আমরা প্রতিটি সত্যকে একদম চোখের সামনে নিশ্চিতভাবে (عين اليقين) দেখতে পাব। সেখানে জান্নাত, জাহান্নাম, সওয়াব,

হিসাব-নিকাশসহ প্রতিটি জিনিস মানুষ তার আসল রূপে জানতে পারবে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বাণী (تَحْسَبُهَا جَامِدَةً) (তুমি মনে করছ সেগুলো স্থির)—এর আসল অর্থ হলো, তুমি যখন এই দুনিয়ায় পাহাড়গুলোর সামনে দাঁড়াও, তখন তুমি এক ধরণের ভ্রমে নিমজ্জিত থাকো; কারণ তুমি ভাবছ সেগুলো স্থির অথচ সেগুলো মেঘের মতো ভেসে চলেছে।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পাহাড়ের এই গতির তুলনা করতে গিয়ে 'মেঘের মতো চলা' (مر السحاب) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আমি আগেই বলেছি যে, কুরআনের শব্দ চয়ন অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও নিখুঁত। মেঘের মতো চলা (مر السحاب)।

এখানে আল্লাহ কেন ‘বাতাসের মতো চলা’ (مـر الرياح), ‘ঝড়ের মতো চলা’ (مـر العواصف), ‘ঢেউয়ের মতো চলা’ (مر الامواج) বা অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করলেন না? কারণ মেঘ কখনো নিজের শক্তিতে বা নিজস্ব গতিতে নড়াচড়া করতে পারে না; বরং তার পেছনে একটি বাহ্যিক শক্তি কাজ করে—তা হলো বাতাসের ধাক্কা। মেঘ যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়, সে নিজে ডানা মেলে উড়ে যায় না; বরং বাতাস এসে তাকে এক স্থান থেকে তুলে অন্য স্থানে নিয়ে যায়।

আল্লাহ যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাচ্ছেন—"মনোযোগ দাও! পাহাড়ের এই গতি কিন্তু তার নিজস্ব কোনো গতি নয়—যেমনটি পৃথিবীর নিজস্ব ঘূর্ণন গতি আছে বা বাতাসের নিজস্ব গতি আছে। পাহাড় নিজে নিজে নড়াচড়া করে না; অর্থাৎ সে পৃথিবীর বুক থেকে নিজে হেঁটে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় না, না—তার স্থান পৃথিবীর বুকে নির্দিষ্ট ও স্থির। কিন্তু তবুও সে মেঘের মতো ভেসে চলেছে; যার অর্থ হলো সে পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির সাথে সাথেই ঘুরছে, ঠিক যেভাবে বাতাস মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।"

তা না হলে আল্লাহ কেন এটি বললেন না যে—"তুমি পাহাড়গুলোকে দেখছ স্থির, অথচ সেগুলো চলছে বা দৌড়াচ্ছে বা নড়াচড়া করছে বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়

চলে যাচ্ছে?" না, তিনি এমন সমস্ত শব্দকে বর্জন করেছেন যা পাহাড়ের নিজস্ব গতিকে নির্দেশ করতে পারত। এর অর্থ দাঁড়ায়—যিনি নিজের শক্তিতে ঘুরছেন তিনি হলেন স্বয়ং পৃথিবী, আর পাহাড়গুলো তার সেই গতির অনুগামী হয়ে মেঘের মতোই ভেসে চলেছে যার নিজস্ব কোনো গতি নেই। আপনি কি কুরআনে পৃথিবীর আবর্তনের এই নিখুঁত শব্দশৈলী এবং নিখুঁত চিত্রায়ণ দেখতে পাচ্ছেন? মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষে কি নিজের থেকে এই কথা বলা বা এই বিজ্ঞানে পৌঁছানো কখনো সম্ভব ছিল? একেই কি অলৌকিকত্ব বা মু'জিযা বলা হয় না?

বিজ্ঞানীরা যখন বলেন যে পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপর ঘোরে, তখন আমরা তাদের বলি—এই মহাজাগতিক সত্যটি কুরআন অনেক আগেই স্পর্শ করেছে, এমনকি এর সূক্ষ্ম বিবরণও দিয়ে রেখেছে যে, পৃথিবীর ওপর থাকা প্রতিটি বস্তু—এমনকি এই সুউচ্চ বিশাল পাহাড়গুলোও—পৃথিবীর নিজস্ব আবর্তন গতির অনুসারী হয়ে ঘুরছে। আর এটি অবশ্যই এই দুনিয়ার বুকে ঘটছে। কারণ আখেরাতে তো আল্লাহ পাহাড়গুলোকে ধূলিসাৎ করে দেবেন, আর সেখানে কোনো সংশয় বা ধারণা থাকবে না—বরং থাকবে চূড়ান্ত নিশ্চিত বিশ্বাস। সুতরাং কুরআন যেভাবে ভবিষ্যতের পর্দা ছিঁড়ে অনাগত যুগের মহাজাগতিক সত্যগুলোকে এভাবে উন্মোচন করেছে, তা চৌদ্দশত বছর পর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রযাত্রাকেই প্রমাণ করে।

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, কুরআন পুরো মানবজাতির জন্য ভবিষ্যতের এক বিশাল পর্দা উন্মোচন করে দিয়েছে। কিন্তু কিছু মানুষ আজও মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে অনর্থক বিতর্ক করে; যা মূলত মানুষকে বিভ্রান্ত করার এবং মহাবিশ্বে আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করার একটি অপচেষ্টা মাত্র। আর দুনিয়ায় এই ধরণের বিভ্রান্তকারী মানুষের অস্তিত্ব থাকা এবং তাদের আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করাটাও কুরআনের অন্যতম একটি ভবিষ্যৎবাণী ও অলৌকিকত্ব! কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই ধরণের মানুষের আবির্ভাবের আগেই কুরআনে তাদের সম্পর্কে আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন; যা আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি।

তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপই পাঠিয়েছি

(রমজান মাস হলো কুরআনের মাস, এটি রহমত, মাগফিরাত এবং সাম্যের মাস। এটি সেই মাস যে মাসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এই ওহী নাজিল হয়েছিল যা পুরো বিশ্বজগতের জন্য এক অনন্য রহমত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন: "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপই পাঠিয়েছি।" আর এই অংশটি মূলত এই বরকতময় আয়াতের তাফসীর ও ব্যাখ্যা নিয়ে রচিত।)

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যখনই তাঁর বান্দাদের কাছে নবী-রাসূলদের পাঠিয়েছেন, তখন প্রত্যেক রাসূলই কোনো না কোনো রহমত নিয়ে এসেছেন। সেটি কীভাবে? আমরা যদি পৃথিবীর প্রথম মানুষের দিকে তাকাই এবং আজকের আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকাই, তবে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্য আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। তা হলো—ভবিষ্যতের দিকে তাকালে যে জিনিসটি দিন দিন বৃদ্ধি পায়, অতীতের দিকে পিছন ফিরে তাকালে সেটি ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।

আমরা যদি মানুষের জনসংখ্যা ও তাদের বংশবৃদ্ধির দিকে তাকাই, তবে দেখব সত্তরের দশকে জনসংখ্যা ষাটের দশকের চেয়ে বেশি ছিল; আবার ষাটের দশকে তা পঞ্চাশ ও চল্লিশের দশকের চেয়ে বেশি ছিল। অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে মানুষের বংশবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এখন আমরা যদি এই ধারাকে উল্টো দিকে অর্থাৎ অতীতের দিকে নিয়ে যাই, তবে গ্রাফ বা রেখাটি ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নামতে থাকবে এবং কমতে কমতে এমন এক শুরুর বিন্দুতে (نقطة البداية) গিয়ে পৌঁছাবে, যেখান থেকে মানবজাতির এই বিশাল বংশবৃদ্ধির সূচনা হয়েছিল। আর এই শুরুর বিন্দুর আদি পিতা ও মাতা হলেন আদম ও হাওয়া (আ.)। জনসংখ্যার এই নিম্নগামী গ্রাফটি আমাদের নিশ্চিতভাবেই সেই আদি সূচনার বিন্দুতে নিয়ে যাবে।

আর এই মানুষের বংশবৃদ্ধি ও সংখ্যাগত প্রসারের জন্য অবশ্যই একজন পুরুষ ও একজন নারীর প্রয়োজন ছিল। যদি মানবজাতির সূচনা কেবল একজন মাত্র পুরুষ বা একজন মাত্র নারী দিয়ে হতো তবে মানবজাতির এই বংশবৃদ্ধি কখনো ঘটত না। আর

সৃষ্টির এই আদি সূচনা সম্পর্কেই পবিত্র কুরআন আমাদের আগেই জানিয়ে দিয়ে বলেছে:

اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সত্তা থেকে এবং তা থেকে তার জোড়া তৈরি করেছেন, আর তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।" (সূরা নিসা- ১)

অর্থাৎ এই বংশের বিস্তার ঘটেছে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। আর তাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকেও পুরুষ ও নারীরা এই বংশ বিস্তারের ধারাকে চালু রেখেছিল। এভাবেই যুগ যুগ ধরে প্রতিটি পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে মানবজাতিতে নতুন নতুন প্রাণের সংযোজন ঘটেছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। হাজার হাজার বা দশ হাজার বছর ধরে মানুষের এই ধারা চলতে চলতে আজ মানবজাতি পৃথিবীর বুকে এই বিশাল জনসংখ্যায় এসে পৌঁছেছে।

এর পর আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে আসি। আল্লাহ যে মানুষকে সৃষ্টি করলেন, যে মানুষ এই পৃথিবীকে সুশোভিত করল এবং আজ আমাদের চোখের সামনে গড়ে ওঠা এই বিশাল আধুনিক সভ্যতা ও নগর জীবনের জন্ম দিল—তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য অবশ্যই কোনো না কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন ছিল। কোনো যোগাযোগের মাধ্যম বা ভাষা ছাড়া মানুষের পক্ষে কখনো সভ্যতা গড়ে তোলা কিংবা সত্যিকারের সামাজিক সহাবস্থান বজায় রাখা সম্ভব হতো না। বিজ্ঞানীরা বলেন, ভাষা হলো মূলত 'অনুকরণের ফসল'। কান যা শোনে, জিহ্বা বা মুখ তা-ই উচ্চারণ করে। কোনো শিশু যদি বধির হয়ে জন্মায় এবং কিছু শুনতে না পায়, তবে সে মুখ দিয়ে কথাও বলতে পারে না।

সুতরাং, ভাষা কোনো রক্তের গ্রুপ নয়, এটি কোনো ভৌগোলিক পরিবেশ, জাতিগত পরিচয় কিংবা বংশগতির বিষয় নয়; বরং মানুষের কান যা শোনে মানুষ মুখ দিয়ে তা-ই উচ্চারণ করে। আমি যদি একজন ফরাসি, আমেরিকান, ওলন্দাজ কিংবা আফ্রিকান—যেকোনো দেশের বা যেকোনো জাতির একটি সদ্যজাত শিশুকে এনে সম্পূর্ণ আরবীভাষী একটি পরিবেশে রেখে দিই এবং সে আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শোনার সুযোগ না পায়, তবে সে বড় হয়ে গড়গড় করে আরবী ভাষাতেই কথা বলবে। যদিও তার মূল বংশ, জাতি, রক্ত কিংবা জিন আরবী নয়। আবার একটি আরবী বংশোদ্ভূত শিশু যদি আরব দেশেই বড় হয়, কিন্তু সে যদি বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শোনার সুযোগ না পায়, তবে সে বড় হয়ে ঠিক সেই আঞ্চলিক বা উপভাষাটিই বলবে যা তার কান ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছে।

কান যা শোনে, জিহ্বা তা-ই অনুকরণ করে। সুতরাং, কোনো শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ বা তাৎপর্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতক্ষণ না কান তা প্রথমবার শুনছে। আপনি যদি একজন বিদেশী মানুষের সামনে—যে কখনো আরবী ভাষা শোনেনি—হঠাৎ আরবী শব্দ উচ্চারণ করেন, তবে সে তার কিছুই বুঝতে পারবে না। ঠিক তেমনি একজন আরবের সামনে যদি ভিন্ন ভাষার কোনো শব্দ বলা হয়, সেও তা কিছুই বুঝতে পারবে না।

তিনি আদম আলাইহিস সালামকে সকল নাম শেখালেন

এখন আমরা পৃথিবীর আদি সূচনার দিকে ফিরে যাই। আমরা যেহেতু প্রমাণ করলাম যে এই পৃথিবীর সূচনা একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে হয়েছিল, তবে তারা নিজেরা প্রথম কীভাবে কথা বললেন? কীভাবে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করলেন? নিশ্চিতভাবেই তাদের কান এমন কিছু শব্দ শুনেছিল যার সাথে তাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয় পরিচিত হয়েছিল এবং তাদের জিহ্বা তা উচ্চারণ করে কথা বলা শুরু করেছিল। কিন্তু যেহেতু তারা ছিলেন পৃথিবীর একদম প্রথম মানুষ এবং শুরুর জোড়া, তবে তারা কার কাছ থেকে এই শব্দগুলো শুনলেন? মানুষের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী যে শুনতে পায় না সে বলতেও পারে না; সুতরাং মানবজাতির আদি পিতা-মাতাকে অবশ্যই এমন একজন শিক্ষক শিক্ষা দিয়েছিলেন যিনি মানুষের জাতির বাইরের কেউ।

অতএব, আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা স্বয়ং ভাষার প্রয়োজনেই একটি অনিবার্য সত্য (ضرورة لغوية)। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অবশ্যই আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছিলেন এবং আদম আলাইহিস সালাম তা শুনেছিলেন; এরপর আদম আলাইহিস সালাম আমাদের মাতা হাওয়া আলাইহাস সালামের সাথে কথা বলেছিলেন এবং হাওয়া আলাইহাস সালাম তা শুনেছিলেন। আর এভাবেই আল্লাহর শেখানো ভাষা থেকে মানুষের পারস্পরিক কথা ও যোগাযোগের ভাষার সূচনা হয়েছিল।

এটি একটি ধ্রুব বাস্তব যে, যেহেতু পুরো মানবজাতি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে শুরু হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে সুন্দর যোগাযোগ ছিল, তাই তারা অবশ্যই ভাষা শুনেছিলেন।

আর এখানেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার এই বাণীর আসল তাৎপর্য প্রকাশ পায়:

(وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا)

অর্থাৎ "এবং তিনি আদম আলাইহিস সালামকে সমস্ত জিনিসের নাম শিক্ষা দিলেন।" (সূরা বাকারাহ- ৩১)

এই আয়াতটি আমাদের সামনে সেই আদি ঘটনাকে স্পষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা আদমকে নামসমূহ শিক্ষা দিয়েছিলেন—যার অর্থ হলো তিনি তাকে কথা বলা, ভাবের আদান-প্রদান করা এবং যোগাযোগের ভাষা শিখিয়েছিলেন। কুরআনের এক অন্যতম অলৌকিকত্ব হলো—এত দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পরও এবং বিজ্ঞানের এত বিশাল অগ্রগতি সত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে এই একই নিয়মই অনুসৃত হয়ে আসছে!

আমরা আজ যখন কোনো ছোট শিশুকে কথা বলা শেখাতে চাই, তখন আমরা তাকে প্রথমে বিভিন্ন জিনিসের 'নাম' (الأسماء) শেখানো শুরু করি; আমরা কিন্তু তাকে শুরুতেই কোনো কাজ বা ক্রিয়া (الأحداث) শেখাতে যাই না। প্রথমত আমরা তাকে নামই শিখাই; যেমন আমরা তাকে বলি—"এটি কলম", "এটি খাতা", "এটি সিংহ", "এটি কাপ", "এটি খাবার", "এটি রাস্তা", "এটি আলো" কিংবা "এটি অন্ধকার"। আমরা তাকে প্রথমে নামগুলো শিখাই এবং সে যখন নামগুলো শিখে যায়, তখন সেই নাম থেকে অন্যান্য শব্দ বা কাজ তৈরি করা তার জন্য অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়।

সুতরাং, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন বলেন: "তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন", তখন আমাদের বুঝতে হবে যে আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে সর্বপ্রথম কথা বলার ভাষা শিখিয়েছিলেন এবং আমাদের এই আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানুষের কথা বলার ভাষা শেখার সূচনা হয় এই নাম শেখার মাধ্যমেই; যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বহু আগেই জানিয়ে দিয়েছেন।

মানুষের সৃষ্টির সাথেই দ্বীনের সূচনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আদম আলাইহিস সালামকে নাম শিক্ষা দেওয়ার এই ঘটনা জানানোর পর—যাতে মানুষ পৃথিবীতে কথা বলতে ও সামাজিক যোগাযোগ করতে পারে—তিনি বললেন:

(اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا)

অর্থাৎ "তোমরা সবাই এখান থেকে (দুনিয়াতে) নেমে যাও।" (সূরা বাকারাহ-৩৮)

আর এটিই ছিল মানুষের জন্য সেই মহান দায়িত্ব যা আল্লাহ আগে ঘোষণা করেছিলেন:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"আমি পৃথিবীতে একজন খলিফা বা প্রতিনিধি পাঠাতে চাই।" (সূরা আল বাক্বারাহ- ৩০)

এরপর আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামের উদ্দেশ্যে তাঁর বাণীর পূর্ণতা দিয়ে বললেন:

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থাৎ "অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়েত তোমাদের কাছে পৌঁছাবে, তখন যারা আমার হেদায়েত অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" (সূরা বাকারাহ-৩৮)

আর অন্য একটি আয়াতে এসেছে:

(فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ)

অর্থাৎ "যে আমার হেদায়েত অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং হতভাগ্যও হবে না।" (সূরা ত্বাহা-১২৩)

সুতরাং আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার পর এবং তার মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশ করার মাধ্যম (ভাষা) শিখিয়ে দেওয়ার পরপরই মানুষের জন্য দ্বীন বা জীবনবিধান (المنهج) অবতীর্ণ করলেন। এই দ্বীন মূলত পৃথিবীতে মানুষের খেলাফতের দায়িত্ব বা জাগতিক কর্মকাণ্ডকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার জন্যই এসেছে। আর নিয়ম ছিল আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর দেওয়া সেই ভাষার মাধ্যমে দ্বীনের এই শিক্ষা তাঁর সন্তানদের কাছে পৌঁছে দেবেন এবং সন্তানেরাও তাদের সন্তানদের কাছে এই দ্বীন পৌঁছে দেবে—এভাবেই ধারাটি চলতে থাকবে।

তবে দ্বীনি জ্ঞানের শিক্ষা দুনিয়ার অন্য সব বিজ্ঞানের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ পার্থিব অন্যান্য বিজ্ঞান—যেমন রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, প্রকৌশল ইত্যাদি শেখার পর মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের আচরণ বা স্বভাব পরিবর্তন করার কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না। অর্থাৎ আপনি কোনো বৈজ্ঞানিক থিওরি বা তত্ত্ব মুখস্থ করলেন, বুঝলেন এবং তা গবেষণায় প্রয়োগ করলেন—এতটুকুই যথেষ্ট; এর বাইরে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আপনি কী করছেন বা না করছেন তা সম্পূর্ণ আপনার নিজের ইচ্ছা। সেখানে আপনার জীবনের স্বাধীন চলাফেরার ওপর কোনো বিধি-নিষেধ বা সীমাবদ্ধতা চাপিয়ে দেওয়া হয় না।

কিন্তু আমি যখন আপনাকে দ্বীন বা ধর্মের শিক্ষা দেব, তখন আমি আপনাকে এমন কিছু শেখাচ্ছি যা সরাসরি আপনার ব্যক্তিগত আচরণ এবং জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করবে। আমি আপনাকে বলব: "এই কাজটি করো (افعل) এবং এই কাজটি করো না (لا تفعل)।" আর এই 'করো না' শব্দটাই মানুষের মনের খেয়ালখুশি এবং কুপ্রবৃত্তির (شهوات النفس) সাথে সরাসরি সজ্ঘাতে লিপ্ত হয়।

পার্থিব অন্যান্য বিজ্ঞানের কাজ হলো কেবল তথ্যটি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে আমি মানুষের কাছে দাবি করব সে যেন তার জীবনের প্রতিটি

পদক্ষেপ আল্লাহর নির্ধারিত 'করো এবং করো না'-এর ছাঁচে ঢেলে সাজায়। এই কারণেই যখন বলা হয় যে 'দ্বীনের শিক্ষা ব্যর্থ হয়েছে', তার অর্থ এই নয় যে মানুষ দ্বীনের হালাল-হারামের নিয়মগুলো জানে না; বরং এর আসল অর্থ হলো মানুষ জেনেবুঝেও সেই নিয়মগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করছে না।

যেহেতু দ্বীন মানুষের বাস্তব জীবনকে সুশৃঙ্খল করার জন্য 'করো এবং করো না' বিধি-নিষেধের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করে, আর মানুষের মন যেহেতু তার খেয়ালখুশি ও প্রবৃত্তির ওপর কোনো লাগাম বা সীমাবদ্ধতা পছন্দ করে না, তাই আদম আলাইহিস সালামের সন্তানদের মধ্য থেকে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ ধীরে ধীরে আল্লাহর নির্দেশিত বিধানগুলোর কিছু কিছু অংশ ভুলে যেতে শুরু করল। সময়ের আবর্তনে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এই বিস্মৃতি এবং অলসতা আরও বাড়তে লাগল। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠালেন যাতে তিনি তাদের পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন।

মূলত রাসূলেরা এই পৃথিবীতে কোনো নতুন দ্বীন বা ওহীর সূচনা করতে আসেননি; কারণ আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার সময়ই তার সাথে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বা মানহাজ দিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষ যদি আল্লাহর নাজিল করা সেই আদি দ্বীনকে অবিকল ধরে রাখতে পারত, তবে পৃথিবীতে আর কোনো নবী-রাসূল পাঠানোর প্রয়োজনই হতো না।

কিন্তু মানুষের নিয়ম হলো—একজন রাসূল এসে তাদের দ্বীন স্মরণ করিয়ে দেন, এরপর মানুষ তা আবার ভুলে যায়। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর তারা আল্লাহর দ্বীন পুরোপুরি পরিত্যাগ করে বসে, তখন আল্লাহ আবার আরেকজন রাসূল পাঠান তাদেরকে জাগ্রত করার জন্য। এভাবেই যুগ যুগ ধরে চলেছে। এমনকি কোনো কোনো যুগে আল্লাহ একই সময়ে একাধিক রাসূলও পাঠিয়েছেন; যেমনটি ঘটেছিল ইব্রাহিম ও লুত (আলাইহিস সালাম)-এর ক্ষেত্রে—তারা দুজনেই একই সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন।

কখনো এমন হতো যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ আল্লাহর পথ ভুলে যাওয়ার কারণে সেখানে রাসূলের আগমন ঘটত, অথচ একই সময়ে পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষ আল্লাহর দ্বীন সঠিকভাবে মেনে চলার কারণে সেখানে কোনো রাসূলের

প্রয়োজন হতো না। সুতরাং সব আসমানী ধর্মের মূল লক্ষ্যই ছিল আদি মানুষের সাথে পাঠানো আল্লাহর সেই মূল জীবনবিধানকে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখা, যাতে মানুষের জাগতিক জীবন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হয়। আর রাসূলরা এসে আদম আলাইহিস সালামের সন্তানদের মধ্যে যারা দ্বীন ভুলে গেছে, পথভ্রষ্ট হয়েছে কিংবা আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করেছে—তাদেরকে সঠিক পথ স্মরণ করিয়ে দিতেন; কারণ প্রবৃত্তির লালসা ও মোহের কারণে মানুষের মধ্যে সবসময়ই এক ধরণের গাফেলতি, উদাসীনতা ও বিচ্যুতি তৈরি হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের এই উদাসীনতা বা গাফলতিকে একটি 'হালকা ঘুম বা তন্দ্রা' (النومة)-র সাথে তুলনা করেছেন, যা মানুষকে আল্লাহর দ্বীন ও শরীয়ত থেকে বিমুখ করে দেয়। তিনি বলেছেন:

يَنَامُ الرَّجُلُ النَّومَة فتَقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثلَ الوَكْتِ

"মানুষ একটি ঘুমে আচ্ছন্ন হবে, আর অমনি তার অন্তর থেকে আমানত (ঈমানের নূর) তুলে নেওয়া হবে। ফলে তার অন্তরে এর সামান্য একটু দাগ বা চিহ্ন রয়ে যাবে—ঠিক যেন একটি হালকা আগুনে ছ্যাঁকা লাগার মতো।"

এর অর্থ হলো মানুষ তার দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যায়, ফলে তার অন্তর থেকে আমানত অর্থাৎ ঈমানের প্রদীপ্ত আলো ছিনিয়ে নেওয়া হয় এবং সেখানে কেবল সামান্য একটু দাগ পড়ে থাকে।

ثُمَّ يَنَامُ النَّومَةَ فَتُقبَض الأَمَانَة مِن قَلْبِه، فَيَظَلُّ أَثَرُها مِثل أَثَر المَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنتَبِراً وَلَيس فِيه شَيء

"এরপর সে আবার আরেকটি ঘুমে আচ্ছন্ন হবে (অর্থাৎ পুনরায় গাফেল হবে), তখন আবার তার অন্তর থেকে আমানত (ঈমানের নূর) তুলে নেওয়া হবে এবং তার অন্তরে

এর দাগটি আরও বড় হয়ে ‘মাজল’ (المجل)—অর্থাৎ ফোস্কার মতো রূপ ধারণ করবে—ঠিক যেমন তুমি যদি একটি জ্বলন্ত কয়লা তোমার পায়ের ওপর গড়িয়ে দাও এবং এর ফলে চামড়াটি ফুলে ওঠে, অথচ তার ভেতরে আসল কোনো প্রাণ থাকে না।" (বুখারি- ৬৪৯৭, মুসলিম- ১৪৩)

মানব মনে এভাবেই ধীরে ধীরে গাফেলতি বা উদাসীনতা প্রবেশ করে। মানুষ একটু একটু করে দ্বীন থেকে দূরে সরে যায় এবং অবহেলা করতে শুরু করে।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে: "মানুষের অন্তরে ফিতনাগুলো একের পর এক আসতে থাকবে—ঠিক যেভাবে চাটাই বা মাদুর একটির পর একটি কাঠি দিয়ে বোনা হয়। যে অন্তর এই ফিতনাকে নিজের ভেতরে চুষে নেবে বা গ্রহণ করবে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ বা বিন্দু পড়ে যাবে। আর যে অন্তর একে প্রত্যাখ্যান করবে, তার অন্তরে একটি সাদা উজ্জ্বল বিন্দু পড়ে যাবে। এভাবে অন্তরগুলো দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে: এক প্রকার অন্তর হবে মসৃণ সাদা পাথরের মতো। আসমান ও জমিন যতদিন থাকবে, কোনো ফিতনাই এই অন্তরের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর অপর অন্তরটি হবে উল্টানো কালো কলসীর মতো ছাই রঙের, যা কোনো ভালো কাজকে ভালো বলে চিনবে না এবং কোনো মন্দ কাজকেও মন্দ বলে প্রত্যাখ্যান করবে না।" আর এটিই হলো সেই 'রান' (الرَّانُ) বা অন্তরের মরিচা, যার সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

(كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم)

অর্থাৎ "কখনোই নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।" (সূরা মুত্বাফফিফীন-১৪)

অর্থাৎ দ্বীনের বিধান থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে আল্লাহর সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্ক পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

সুতরাং, নবী-রাসূলদের সমস্ত কাফেলা মূলত পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষকে সেই আদি প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে যা পিতা আদম আলাইহিস সালামকে দেওয়া হয়েছিল এবং যা আল্লাহ্ ব্যক্ত করেছেন এই বাণীর মাধ্যমে:

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى

"যখনই আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোনো হেদায়েত আসবে।" (সূরা বাকারাহ-৩৮)

কিন্তু মানুষের অন্তরে যেহেতু বারবার গাফেলতি ভর করে, তাই আল্লাহর অসীম রহমতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনি যুগে যুগে ও স্থানে স্থানে রাসূল পাঠিয়েছেন মানুষকে আল্লাহর বিধান স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য।

আর আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন দীর্ঘ বিরতির পর রাসূলদের সর্বশেষ খতমকারী হিসেবে। আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন—পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের মতো তাঁর রিসালাত কিন্তু কেবল কোনো নির্দিষ্ট জাতি কিংবা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

(وَمَا أرسلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ)

অর্থাৎ "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপই পাঠিয়েছি।" (সূরা আম্বিয়া-১০৭)

এরপর আল্লাহ বলেন: (لِلنَّاسِ كَافَّةً) অর্থাৎ "সমগ্র মানবজাতির জন্য।" সুতরাং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই রিসালাত স্থান ও সীমানার দিক থেকে এক সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা যখন তাঁকে (خَاتَمَ النَّبِيِّينَ)

অর্থাৎ "সর্বশেষ নবী" হিসেবে ঘোষণা করলেন, তখন তাঁর এই রিসালাত সময়ের দিক থেকেও এক সার্বজনীন রূপ পেয়ে গেল।

অতএব, এই শরীয়ত ও দ্বীন এসেছে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত যুগের এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের মানুষের জন্য। কিন্তু কেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই রিসালাতকে সময়ের দিক থেকে এবং স্থানের দিক থেকে এতটা সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন করা হলো? এটিও পবিত্র কুরআনের এক অনন্য অলৌকিকত্ব বা ই'জাজ। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর অসীম জ্ঞানে আগে থেকেই জানতেন যে, ভবিষ্যতের এক সময়ে এসে পুরো মানবজাতির সমস্যা, ব্যাধি ও নৈতিক অবক্ষয়গুলো সব এক হয়ে যাবে!

পৃথিবী যত উন্নত হবে এবং মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ যত বৃদ্ধি পাবে, পুরো বিশ্বের মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যাগুলোও তত বেশি অভিন্ন রূপ ধারণ করবে। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রিসালাতের আগে পৃথিবীর সমাজগুলো ছিল পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এক মানবসমাজ নিজের মতো বাস করে বিলীন হয়ে যেত, অথচ পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকা অন্য একটি সমাজ তাদের খবরও জানত না। দূরত্বের কারণে এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে তখন এক অঞ্চলের সাথে অন্য অঞ্চলের মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল প্রায় অসম্ভব বা শূন্যের কোঠায়।

এই কারণেই তখন প্রতিটি সমাজের নিজস্ব কিছু আলাদা সমস্যা, নৈতিক রোগ, বিচ্যুতি এবং দ্বীন থেকে বিমুখতা ছিল। আর নাবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামরাও আসতেন কেবল সেই নির্দিষ্ট সমাজগুলোর হেদায়েতের জন্য। আল্লাহ সেই রাসূলদের নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ের কাছে পাঠাতেন; যেমন আদ জাতি, সামুদ জাতি কিংবা লুত (আলাইহিস সালাম)-এর কওম ইত্যাদি। এমনকি আমি আগেই বলেছি—কখনো কখনো আল্লাহ একই সময়ে একাধিক রাসূল পাঠাতেন; একজন এই সমাজের সমস্যা সমাধান করতেন আর অন্যজন অন্য সমাজের অবক্ষয় দূর করতেন—যেমনটি লুত ও ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর যুগে ঘটেছিল।

তখন মানুষের মধ্যে এক ধরণের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ছিল, আর এই বিচ্ছিন্নতার কারণে তাদের সামাজিক রোগগুলোও ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তাই প্রতি সমাজের জন্য আলাদা রাসূল আসতেন তাদের সুপথ দেখানোর জন্য। কিন্তু আজ যখন পুরো বিশ্ব এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে এবং উন্নত হয়েছে, তখন মানুষের সমস্ত রোগ ও সমস্যাও এক হয়ে গেছে এবং তা একটি সাধারণ বৃত্তের চারপাশে ঘুরছে। আজ আমেরিকায় কোনো ঘটনা ঘটলে ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে তা আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আজ উন্নত কিংবা অনুন্নত—পৃথিবীর সব দেশের মানুষের নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধিগুলো প্রায় একই রকম হয়ে গেছে; কারণ মানুষের মধ্যে এক বিশাল বৈশ্বিক মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে। এখন দুনিয়ার কোথাও কোনো ঘটনা ঘটলে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো বিশ্ব তা জেনে যায়।

যেহেতু মানুষের এই তীব্র যোগাযোগের ফলে তাদের সমস্যা ও ব্যাধিগুলো সব এক হয়ে গেছে, তাই এর সমাধানের প্রেসক্রিপশন বা চিকিৎসাও অবশ্যই এক ও অভিন্ন হতে হবে! আর এই বৈশ্বিক বাস্তবতার কথাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআন নাজিলের সময়ই আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে—ভবিষ্যতে এই পৃথিবী উন্নত হয়ে একটি একক গ্রামে বা পরিবারে পরিণত হবে এবং এর দ্রুত যোগাযোগের কারণে পুরো বিশ্বের সমস্যাগুলো এক হয়ে যাবে। ফলে এর চিকিৎসাও হবে এক। এই কারণেই আল্লাহ এই দ্বীনকে 'রাহমাতাল লিল আলামীন' বা বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন। 'বিশ্বজগতের জন্য রহমত' শব্দের অর্থই হলো—পুরো পৃথিবীর মানুষের রোগ যখন এক হয়ে যাবে, তখন তার মুক্তি ও আরোগ্য দেওয়ার মালিকও হবেন একজনই, যা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে।

আর যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন সর্বশেষ নবী, তার অর্থ হলো তিনি এমন এক দ্বীন ও জীবনবিধান নিয়ে এসেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত যুগের সমস্ত সমস্যার নিখুঁত সমাধান করবে এবং সবার জন্য রহমত হিসেবে জারি থাকবে। কুরআনের এই আরোগ্য, রহমত এবং এই বরকতময় আয়াতের মূল তাৎপর্য হলো—মানবজীবনে এমন কোনো সমস্যা বা সংকট আসতেই পারে না, যার নিখুঁত সমাধান ও চিকিৎসা আল্লাহর এই জীবনবিধানে আগে থেকেই মওজুদ নেই।

আমরা কেন একে 'চিকিৎসা বা আরোগ্য' বলছি? কারণ আল্লাহর এই আইন বা শরীয়ত যখন দুনিয়াতে আসে, তখন তা সমাজে বিদ্যমান বাস্তব সমস্যা ও ছড়িয়ে পড়া অন্যায়-অবিচারকে দূর করার জন্যই আসে; এটি সমাজকে সেই পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে আরোগ্য দান করে। আর আমরা যদি শুরু থেকেই আল্লাহর এই বিধান পুরোপুরি মেনে চলি, তবে সমাজে কোনো অন্যায়, অবক্ষয় বা সামাজিক ব্যাধি আসতেই পারবে না! এমতাবস্থায় এই দ্বীন সমাজের যাবতীয় বিচ্যুতি ও পঙ্কিলতা থেকে আমাদের জন্য একটি অগ্রিম 'সুরক্ষা বা ঢাল' (وقاية) হিসেবে কাজ করে। এই কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ)

অর্থাৎ "আর আমি কুরআনে এমন কিছু নাজিল করি যা আরোগ্য এবং রহমত।" (সূরা বানী ইসরাইল/ ইসরা- ৮২)

এখানে 'আরোগ্য' (شفاء) মানে হলো—এটি সমাজের বুকে তৈরি হওয়া যাবতীয় নৈতিক অবক্ষয় ও অন্যায়ের নিখুঁত চিকিৎসা করে। আর 'রহমত' (رحمة) মানে হলো—এটি সমাজে এই ধরণের মারাত্মক ব্যাধি ও সংকটের আগমনকেই চিরতরে বন্ধ করে দেয়; আর এটিই হলো মানুষের জন্য আল্লাহর সবচেয়ে বড় করুণা ও রহমত।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্থান ও কালের দিক থেকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এমন কিছু শাশ্বত নীতিমালা নিয়ে এসেছেন যা মানুষের জন্য পরম রহমত। আর এই রহমতের আসল অর্থ হলো—আমরা যদি এই নীতিমালাগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি, তবে সমাজে কখনো কোনো বিপর্যয় বা অবক্ষয় সৃষ্টিই হবে না যা আমাদের পরবর্তীতে দূর করতে হবে। কিন্তু আমরা যখনই এই নীতিমালাগুলো ভুলে যাই বা অবহেলা করি, তখনই সমাজে তার মারাত্মক কুফল ও ক্ষতি প্রকাশ পেতে শুরু করে। তখন আমরা আবার এর প্রতিকার নিয়ে চিন্তা করতে বসি এবং পরিশেষে আবিষ্কার করি যে—আমরা আসলে আল্লাহর নির্দেশিত অমুক অমুক মৌলিক নীতি বর্জন করার

কারণেই এই বিপদে পড়েছি! তখন আবার আল্লাহর সেই বিধানের আলোকেই সমাজের চিকিৎসা শুরু হয়।

সুতরাং, আল্লাহর বাণী

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ)

অর্থাৎ "আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপই পাঠিয়েছি।" (সূরা আম্বিয়া-১০৭)

এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ হলো—হে নবী, তুমি আমার পক্ষ থেকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান নিয়ে মানুষের কাছে এসেছ, যা যদি তারা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করে তবে পুরো সমাজ আল্লাহর রহমতে ছেয়ে যাবে; ফলে সমাজে মানুষের কোনো দুঃখ-কষ্ট, দুর্দশা কিংবা সামাজিক বিপর্যয় আর অবশিষ্ট থাকবে না।

দ্বীন বা ধর্মের মূল বিষয় কিন্তু কেবল আখেরাত বা পরকালকে কেন্দ্র করেই নয়; বরং এটি দুনিয়ার বুকে মানুষের প্রতিটি কাজ ও জীবনযাত্রাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা ও সুশৃঙ্খল করার জন্যই এসেছে। আর আখেরাত হলো মূলত পুরস্কারের জায়গা—যেখানে আপনি দুনিয়াতে আল্লাহর এই জীবনবিধান কতটা মেনে চলেছেন বা চলেননি তার চূড়ান্ত প্রতিদান দেওয়া হবে। দ্বীনের এই আইন এবং এর সুমহান শিক্ষাগুলো মূলত দুনিয়াতে বেঁচে থাকা মানুষদের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে; যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নিজেই বলেছেন:

(لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا)

অর্থাৎ "যাতে এটি জীবিত বা প্রাণবন্ত মানুষদেরকে সতর্ক করতে পারে।" (সূরা ইয়াসিন-৭০)

কোনো বিষয়ের প্রতিদান বা পুরস্কার কিন্তু সেই বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য বস্তু নয়। এ কারণে দ্বীন কেবল অদৃশ্য বা গায়েবী বিষয়ের (الغيبيات) মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অদৃশ্য বিষয়গুলোকে কেবল তারাই বিশ্বাস করবে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে; কারণ এই খবরগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। কিন্তু একজন অবিশ্বাসী বা কাফেরের কাছে তো এই পার্থিব জীবনের বাস্তবতাই শেষ কথা।

তাই এই বাস্তব জীবনই আমাদের প্রমাণ করে দেয় যে—আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা এই জীবনবিধানকে যদি মানুষ আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তবে মানবসমাজ থেকে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট ও হাহাকার চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে। আর এই বিষয়টিই কুরআন অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছে:

(فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا)

অর্থাৎ "যে আমার হেদায়েত অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবনযাত্রা হবে অত্যন্ত সংকীর্ণ বা কষ্টদায়ক।" (সূরা ত্বাহা-১২৪)

আর এটি ঘটবে এই দুনিয়ার বুকেই। এর পর আল্লাহ আখেরাত সম্পর্কে বলেন:

(وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ)

অর্থাৎ "এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় পুনরুত্থিত করব।" (সূরা ত্বাহা-১২৪)

আল্লাহর এই বাণী 'সংকীর্ণ বা কষ্টদায়ক জীবনযাত্রা' (معيشة ضنكا) প্রমাণ করে যে—আল্লাহর এই বিধানগুলো মূলত মানুষকে এই দুনিয়ার বুকে যাবতীয় সংকীর্ণতা, অশান্তি ও জীবনযাত্রার হাহাকার থেকে রক্ষা করার জন্যই নাজিল হয়েছে। আর মানুষের এই জীবনযাত্রার কষ্ট বা অশান্তি কিন্তু কেবল অর্থনৈতিক বা টাকা-পয়সার অভাবের সাথেই

যুক্ত নয়; এটি কেবল সম্পদের ওপর নির্ভরশীল নয়। জীবনযাত্রার সংকীর্ণতা বা 'দঙ্ক' (ضنك) শব্দের আসল অর্থ হলো—মানসিক ও আত্মিক চরম অস্থিরতা ও জীবন নিয়ে হাঁপিয়ে ওঠা। এর পেছনে বহুবিধ কারণ থাকতে পারে।

কখনো কখনো একজন মানুষের কাছে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ থাকতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার জীবন নিয়ে এক চরম অশান্তি ও সংকীর্ণতার মধ্যে দিনাতিপাত করে। কারণ মানুষের মনের বা আত্মার তো অনেকগুলো দিক রয়েছে; টাকা-পয়সা হয়তো তার বাহ্যিক কোনো একটি দিকের ক্ষুধা মেটাতে পারে, কিন্তু তার ভেতরের অন্যান্য দিকগুলো চরম হাহাকার, শূন্যতা ও অশান্তির মধ্যেই ডুবে থাকে। এই কারণেই আমরা প্রায়ই দেখি যে, বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো মানুষ জীবনের এই মানসিক অশান্তি সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়! কেন এমন হয়?

আমি এর একটি চমৎকার উদাহরণ হিসেবে সুইডেনের কথা উল্লেখ করেছিলাম। সুইডেন হলো মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে এবং জাগতিক জীবনের ভোগ-বিলাসের দিক থেকে পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষ একটি দেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে দেশের সরকারি পরিসংখ্যানই আমাদের বলে যে—সুইডেন আজ আত্মহত্যার হার এবং মানসিক ও স্নায়বিক রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যার দিক থেকেও পুরো বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ একটি দেশ! সুতরাং বিষয়টি কেবল বস্তুগত বা টাকা-পয়সার বিষয় নয়। জীবনের এই চরম অশান্তি ও হাহাকারকে শুধু ধনের অভাব হিসেবে দেখলে চলবে না; বরং মানুষের জীবনে এমন অনেক আত্মিক ও মানসিক দিক রয়েছে যা মানুষের মনে টাকা-পয়সার অভাবের চেয়েও অনেক বেশি তীব্র ও মারাত্মক মানবিক কষ্টের জন্ম দেয়।

আমরা যদি আল্লাহর বিধানের উল্টো পথে চলি, তাহলে আমাদের লজ্জা বা দুর্বলতা (আওরাত) প্রকাশ পেয়ে যায়। এতক্ষণে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত যুগ এবং সমস্ত স্থানের জন্য এক সার্বজনীন রহমত বা দয়া হিসেবে এসেছিলেন, যার মূলনীতিই হলো রহমত। আমরা

যদি তা অনুসরণ করতাম, তবে দুনিয়ার যাবতীয় কষ্ট ও দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতাম এবং আখেরাতেও এর মহৎ প্রতিদান পেতাম। আর এটাই হলো প্রকৃত রহমত।

এই পুরো বিষয়টি আমাদেরকে আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামের সাথে যা ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁকে সেই গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু যখনই তাঁরা সেই গাছের ফল আস্বাদন করলেন, তখনই তাঁদের লজ্জাস্থান তাঁদের সামনে প্রকাশ পেয়ে গেল। এর মানে হলো, আল্লাহর আদেশ অমান্য বা লঙ্ঘন করলেই মানুষের লজ্জা বা ত্রুটি প্রকাশ পায়। সুতরাং, যেকোনো সমাজে আপনি যদি কোনো ধরণের পঙ্কিলতা বা অবক্ষয় দেখেন এবং তার কারণ অনুসন্ধান করেন, তবে দেখতে পাবেন যে— আল্লাহর কোনো না কোনো মূলনীতি বা বিধানকে দুনিয়াতে অকেজো বা অচল করে রাখার কারণেই এমনটা ঘটেছে।

যদি সমাজে এই নিয়ম না থাকত, তবে মহাবিশ্বের এই সৌন্দর্যই বজায় থাকত না। জীবনের সৎ ও অসৎ—উভয় মানুষের পরিণতি যদি একই হতো, তবে তাতে কোনো সৌন্দর্য থাকত না। একজন পরিশ্রমী ছাত্র এবং যে ছাত্র একেবারেই পড়াশোনা করে না, তারা দুজনেই যদি পরীক্ষায় পাস করে যায়, তবে তা জীবনের কোনো সৌন্দর্য হতে পারে না। বরং এটি এমন এক রূপ যা উল্টো কুশ্রীতা বয়ে আনবে; কারণ এখানে পরিশ্রমী ও অলসকে সমান করে দেওয়া হলো, যার ফলে ভবিষ্যতে আর কেউই পরিশ্রম করতে চাইবে না।

ঠিক তেমনি, আল্লাহর বিধান থেকে দূরে থাকা সমাজগুলোতে যদি কষ্ট, বিপর্যয় ও অবক্ষয় তৈরি না হতো, তবে দ্বীন বা ধর্মের সত্যতার কোনো প্রমাণ বা সৌন্দর্য থাকত না। ধর্মের সবচেয়ে বড় প্রমাণই হলো এই যে, যে দল বা সমাজ আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যাবে, তাদের জীবনে কষ্ট, ব্যাধি, বিশৃঙ্খলা ও বিচ্যুতি নেমে আসবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দুনিয়ার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই প্রমাণ করে দেন যে, তাঁর দেওয়া জীবনবিধান ও শিক্ষা কতটা সত্য।

আল্লাহ মানুষের জন্য তাওবার (ক্ষমা প্রার্থনার) পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তবে এখানে আমি আরও একটি ব্যাপক অর্থ যোগ করতে চাই: মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের আগে, আসমান বা আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলদের দায়িত্ব ছিল কেবল মাত্র বাণী পৌঁছে দেওয়া (তাবলীগ করা)। আর অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারীদের শাস্তি বা শায়েস্তা করার দায়িত্ব আসমান নিজেই নিজের হাতে রাখত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে এর উল্লেখ করে বলেছেন— "তাদের কাউকে আমি পানিতে ডুবিয়ে মেরেছি, কাউকে মাটির নিচে ধসিয়ে দিয়েছি, আবার কাউকে প্রচণ্ড আওয়াজ বা বজ্রপাত আঘাত করেছে।" অর্থাৎ, আগের যুগে আসমানই অবাধ্যদের শাস্তি দিত, আর রাসূলদের কাজ ছিল শুধুমাত্র বাণী পৌঁছে দেওয়া।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এসে আল্লাহ ইসলামকে এই দায়িত্ব ও নিরাপত্তা দিলেন যে, ইসলাম নিজেই অবাধ্যদের শায়েস্তা করার কাজ করবে (অর্থাৎ ইসলামী বিধানের মাধ্যমেই সমাজ পরিচালিত ও সংশোধিত হবে)। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করবে, আখেরাতের আজাব তো আছেই, তার পাশাপাশি দুনিয়াতেও তার জীবন হয়ে উঠবে সংকীর্ণ ও কষ্টকর।

এই কারণেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ছিল সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য এক পরম রহমত—সেটা কাফের হোক কিংবা মুমিন, সবার জন্যই। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগের উম্মতদের মতো কাফেরদের ওপর দুনিয়াতে সাথে সাথে আজাব নামিয়ে দেওয়া হয়নি, বরং তাদের তাওবা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

যেমন কুরআনে বলা হয়েছে:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

"আল্লাহ কখনোই তাদের ওপর আজাব দেবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে আছেন, আর আল্লাহ তাদের ওপর আজাব দেবেন না যখন তারা ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) করতে থাকে।"(সূরা আনফাল- ৩৩)

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর নবীকে মুমিন-কাফের নির্বিশেষে পুরো দুনিয়ার জন্য দুনিয়াবী আজাব থেকে মুক্তির এক রহমত হিসেবে পাঠিয়েছেন, যাতে তাদের সামনে তাওবার দরজা খোলা থাকে এবং আখেরাতে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন। আর পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের আসল অর্থও এটাই: "আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।"

লাইলাতুল কদর (কদরের রাত)

লাইলাতুল কদর হলো সেই রাত যে রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআন চিরন্তন (আজালি), কারণ এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একটি গুণ (কালাম)। আর সেই কারণেই এই রাতে কুরআনকে লাওহে মাহফুজ (সংরক্ষিত ফলক) থেকে প্রথম আসমানে (দুনিয়ার আকাশে) নামিয়ে আনা হয়, যাতে এটি মানুষের বাস্তব জীবনে "এই কাজ করো আর এই কাজ থেকে বিরত থাকো" বা আদেশ-নিষেধের মাধ্যমে তার মূল দায়িত্ব শুরু করতে পারে।

আমরা যদি চন্দ্র সন (হিজরি বছর) এবং সৌর সনের (ইংরেজি বছর) মধ্যকার পার্থক্যের দিকে তাকাই, তবে দেখতে পাব যে লাইলাতুল কদর বছরের প্রতিটি দিনেই ঘুরে ঘুরে আসে। কারণ রমজান মাস কখনো বসন্তে, কখনো শরতে, কখনো গরমে আবার কখনো শীতে আসে। অর্থাৎ এটি পুরো বছর জুড়ে আবর্তিত হয়। সৌর বছরের এমন কোনো মাস নেই যা রমজান মাস বা রমজানের কোনো অংশকে দেখেনি। আর দীর্ঘ সময়ের হিসেবে দেখলে দেখা যাবে যে, লাইলাতুল কদরও পুরো বছরের প্রতিটি দিনের ওপর দিয়েই কোনো না কোনো সময় অতিক্রম করেছে।

এখানে ইবাদতের জন্য "রাত"-কে বেছে নেওয়ার কারণ হলো—এটি এমন এক সময় যখন ইবাদত কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হয়। রাতের মাঝে এক ধরণের বিশুদ্ধতা, নীরবতা ও অনুভূতির সততা থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদতে লোক-দেখানো ভাব (রিয়া) বা মুনাফিকি করতে চায়, সে কখনোই রাতের বেলা একা একা বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে পারে না। রাতের বেলা কেবল সেই ব্যক্তিই দাঁড়ায় যে আল্লাহর প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল, বিনীত এবং তাঁর ওপর মনেপ্রাণে বিশ্বাসী।

আল্লাহ যখন তাঁর সৃষ্টিজগৎকে অনুগ্রহ করার জন্য যেকোনো একটি সময়, একটি স্থান কিংবা কোনো একজন ব্যক্তিকে বেছে নেন এবং তাঁকে তাঁর রিসালাত বা বাণী প্রচারের জন্য মনোনীত (মনোনয়ন) করেন, তখন সেই নির্বাচনটি আসলে পুরো মানবজাতির জন্যই কল্যাণ বয়ে আনে।

উদাহরণস্বরূপ, মক্কাকে আল্লাহর পবিত্র ঘরের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়াটা আসলে পুরো বিশ্ববাসীর জন্যই এক বিরাট সম্মান। কারণ পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে মানুষ সেখানে হজ করতে যায়, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে, আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করে এবং নিষ্পাপ হয়ে নিজ দেশে ফিরে আসে। সুতরাং, এই কল্যাণ কেবল মক্কার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তা পুরো বিশ্বজুড়ে আল্লাহর রহমত হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বজগতের জন্য রহমত হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং আমরা সবাই তাঁর সর্বোচ্চ মর্যাদা ও 'মাকামে মাহমুদের' জন্য দোয়া করি। এই দোয়ার মাধ্যমে আমরা মূলত নিজেদের জন্যই দোয়া করি। কারণ কিয়ামতের দিন তিনি যখন সেই প্রশংসিত স্থান বা মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত হবেন, তখন তিনি আমাদের সবার জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবেন। ফলে তাঁর উসিলায় আমাদের কাছে আল্লাহর কল্যাণ ও রহমত এসে পৌঁছাবে।

ঠিক একইভাবে, লাইলাতুল কদরকে বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্যও হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরো পৃথিবীতে ফজল ও রহমত ছড়িয়ে দেওয়া। মানব আত্মা যদি এই দুনিয়ায় শান্তিতে বেঁচে থাকতে চায়, তবে তাকে কয়েকটি জিনিস থেকে মুক্তি পেতে হবে। প্রথমত- "ভয়" (যা সাধারণত জানা কোনো বিপদের কারণে আসে)। দ্বিতীয়ত- "চিন্তা ও দুঃখ" যা অন্তরে প্রবেশ করে (যা অনেক সময় অজানা কোনো কারণে আসতে পারে)। তৃতীয়ত- "ষড়যন্ত্র" (অন্যরা যখন আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে)। আর লাইলাতুল কদর হলো শান্তি ও সুরক্ষার রাত। কারণ এটি আমাদের সেই কুরআনের কথা মনে করিয়ে দেয়, যা অনুসরণ করলে আমাদের মন থেকে সব ভয়, দুশ্চিন্তা ও দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.) বলতেন— "আমি সেই ব্যক্তির জন্য আশ্চর্য বোধ করি যে কোনো কিছুকে ভয় পায়, অথচ সে কেন আল্লাহর এই বাণীর দিকে ছুটে যায় না: (**حسبنا الله ونعم الوكيل** – আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার কর্মবিধায়ক)। কারণ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এর পরপরই বলেছেন: (**فانقلبوا**

بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء - অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এলো, কোনো অনিষ্টই তাদের স্পর্শ করতে পারল না)।

আমি সেই ব্যক্তির জন্য আশ্চর্য বোধ করি যে দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়, অথচ সে কেন আল্লাহর এই বাণীর দিকে ছুটে যায় না: (لا إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين - তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম)। কারণ আল্লাহ এর পরেই বলেছেন: (فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين - অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম; আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি)।

আমি সেই ব্যক্তির জন্য আশ্চর্য বোধ করি যার বিরুদ্ধে চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, অথচ সে কেন আল্লাহর এই বাণীর দিকে ছুটে যায় না: (وافوض أمري الى الله..ان الله بصير بالعباد - আমি আমার সমস্ত বিষয় আল্লাহর কাছে সঁপে দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সর্বদ্রষ্টা)। কারণ আল্লাহ এর জবাবে বলেছেন: (فوقاه الله سيئات ما مكروا - অতঃপর তারা যে কুচক্র করেছিল, আল্লাহ তাকে তার অমঙ্গল থেকে রক্ষা করলেন)।

এবং আমি সেই ব্যক্তির জন্য আশ্চর্য বোধ করি যে দুনিয়া ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, অথচ সে কেন আল্লাহর এই বাণীর দিকে ছুটে যায় না: (ما شاء الله لا قوة الا بالله - আল্লাহ যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কোনো শক্তি নেই)। কারণ আমি আল্লাহকে এর পরপরই বলতে শুনেছি: (ان ترن انا أقل منك مالا وولدا..فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك - তুমি যদি আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দিক থেকে তোমার চেয়ে কম দেখ, তবে আশা করা যায় আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়েও উৎকৃষ্ট কিছু দান করবেন)।"

এই মহাবিশ্বে যেকোনো ঘটনা ঘটার জন্য অবশ্যই একজন "কর্তা" (যে কাজটি করবে) এবং একটি "কর্ম" (যার ওপর কাজটি করা হবে) থাকতে হয়। অনেক সময় কর্তা ও কর্ম দুটোই থাকে, কিন্তু যে কারণে কাজটি তৈরি হবে অর্থাৎ "কারণটি" অনুপস্থিত থাকে। সুতরাং, যেকোনো ঘটনা ঘটার জন্য এই তিনটি উপাদানের উপস্থিতি আবশ্যক: কর্তা, কর্ম এবং কারণ। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের আদব বা শিষ্টাচার শিখিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার কথা বললে 'ইনশাআল্লাহ' (যদি আল্লাহ চান) না বলে না বলি: (**ولا تقولن لشئ اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله** - আর কখনোই কোনো বিষয়ের জন্য বলো না যে, আমি এটি আগামীকাল করব—আল্লাহ যদি চান (ইনশাআল্লাহ) বলা ছাড়া)।

আপনাকে কেন ইনশাআল্লাহ্ বলতে হবে?

আপনাকে কেন "ইল্লা আন ইয়াশাআল্লাহ" বা ইনশাআল্লাহ বলতে হবে? কারণ আপনি এই কাজের একটি উপাদানেরও মালিক নন। আগামীকাল বা কয়েক ঘণ্টা পর কর্তা হিসেবে আপনি নিজে বেঁচে থাকবেন কি না, সেই অস্তিত্বের মালিক আপনি নন। আগামীকাল কর্ম বা বিষয়টি থাকবে কি না, তারও মালিক আপনি নন। এমনকি আগামীকাল সেই কারণ, সময় বা স্থান ঠিক থাকবে কি না, তারও কোনো মালিকানা আপনার নেই। তাই আগামীকাল আমি এই কাজটি করব—এ কথাটি বলা কেবল একটি রূপক মাত্র। আর এই কারণেই বিষয়টিকে তাঁর দিকেই ফিরিয়ে দিতে হবে যিনি এসবের প্রকৃত মালিক, এবং বলতে হবে—যদি আল্লাহ চান। আর তখনই আপনি অসত্য থেকে বের হয়ে সত্য ও বাস্তবতার মুখোমুখি হতে পারবেন।

যেহেতু প্রতিটি ঘটনার পেছনে এই উপাদানগুলো থাকে, তাই কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনার জন্যও একজন নাযিলকারী (আল্লাহ), একজন যার ওপর নাযিল করা হয়েছে (রাসূলুল্লাহ সা.), নাযিলের একটি কারণ, একটি স্থান এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন ছিল। লাইলাতুল কদর মূলত কুরআন নাযিলের সেই "সময়" বা কালকে নির্দেশ করে। তবে আমরা যদি কুরআনের দিকে তাকাই, তবে দেখব যে কুরআন যেমন লাইলাতুল কদরে নাযিল হয়েছে, তেমনি লাইলাতুল কদরের বাইরেও নাযিল হয়েছে। কারণ এটি বিভিন্ন ঘটনা ও প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময় ধরে ধাপে ধাপে নাযিল হয়েছে; এটি রাতে নাযিল হয়েছে, দিনে নাযিল হয়েছে এবং সব সময়েই নাযিল হয়েছে।

তবে লাইলাতুল কদরে কুরআন নাযিল হওয়ার অর্থ হলো—আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছিল যে, কুরআনকে তাঁর অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে দুনিয়াতে প্রকাশ করবেন যাতে এটি মানবসমাজে তার মূল দায়িত্ব শুরু করতে পারে; অর্থাৎ অদৃশ্য জগৎ (আলমে গাইব) থেকে দৃশ্যমান জগতে (আলমে শাহাদাহ) এর প্রকাশ ঘটে।

কুরআন অবতীর্ণ করার বিষয়টি সরাসরি আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পৃক্ত, যার প্রমাণ আল্লাহর বাণী: (وبالحق أنزلناه وبالحق نزل - আর আমি সত্যসহ এটি নাযিল করেছি এবং এটি সত্য নিয়েই নাযিল হয়েছে)। আবার এটি জিবরাঈল (আ.)-এর দিকেও সম্পৃক্ত করা হয়: (نزل به الروح الامين - এটি নিয়ে রুহুল আমীন (জিবরাঈল) অবতরণ করেছেন)। এর মানে হলো—যিনি এটি নিয়ে এসেছেন তিনি হলেন রুহুল আমীন, কিন্তু যিনি এটি পাঠিয়েছেন তিনি স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা।

কুরআনের পরিভাষায় "আনযালা" (নাযিল করেছেন) শব্দটি কেবল আল্লাহর জন্যই ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী: (انا أنزلناه في ليلة القدر - নিশ্চয়ই আমি এটি লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি)। অর্থাৎ আমি এটিকে লাওহে মাহফুজ থেকে, যেখানে এটি গাইবের জগতে গোপন ছিল, সেখান থেকে বের করে দুনিয়ায় তার মিশন বা দায়িত্ব শুরু করার জন্য নিয়ে এসেছি।

যেহেতু এটি লাইলাতুল কদরে নাযিল করা হয়েছে, তাই কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য কেবল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া নয়, বরং কুরআনের কার্যকারিতা সরাসরি শুরু করা। আর এই কারণেই আলেমদের এই কথাটি সঠিক যে, এটি লাওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশে নাযিল হয়েছে তার দায়িত্ব শুরু করার জন্য, এবং এটিও অসম্ভব নয় যে কুরআনের প্রথম অংশ বা প্রথম আয়াতটি এই রাতেই রাসূলের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

আমাদের যে বিষয়টি বুঝতে হবে তা হলো—আল্লাহ যখন কুরআনকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেন এবং তা নিয়ে অবতরণের দায়িত্ব জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেন, তার অর্থ হলো জিবরাঈল (আ.) এটিকে ঠিক সেভাবেই বহন করে নিয়ে এসেছিলেন যেভাবে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত এতে কোনো ধরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংশোধন করা হয়নি; বরং এটি অবিকল তেমনই আছে যেমনটি আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছিলেন।

সুতরাং লাইলাতুল কদর হলো সেই রাত যে রাতে আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে দুনিয়ায় তার অস্তিত্ব ও দায়িত্ব প্রকাশের জন্য নাযিল করেছিলেন; দুনিয়ার আকাশে নাযিল করেছিলেন যাতে জিবরাঈল সেখান থেকে নিয়ে তা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করতে পারেন। জিবরাঈল (আ.) গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত কুরআন ছিল আল্লাহর অদৃশ্যের অন্তরালে। এরপর জিবরাঈল যখন তা রাসূলুল্লাহর কাছে নিয়ে আসছিলেন, তখনো তা রাসূলের কাছে অদৃশ্য ছিল। আর রাসূলুল্লাহ যখন তা গ্রহণ করে মানুষের কাছে প্রচার করলেন, তখন থেকে তা আমাদের কাছে দৃশ্যমান হলো। তাই আল্লাহর বাণী—"নিশ্চয়ই আমি এটি লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি"—এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাযিল করার অর্থ হলো আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে মহাবিশ্বে কুরআনের দায়িত্বের আনুষ্ঠানিক সূচনা হওয়া; অর্থাৎ প্রথমে এটি একসাথে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয় এবং পরবর্তীতে জিবরাঈল (আ.) প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ধাপে ধাপে তা নিয়ে আসতেন।

সময় বা কাল নিজের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত নয়

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, আল্লাহর বাণী (انا أنزلناه - নিশ্চয়ই আমি এটি নাযিল করেছি)-তে 'ইন্না' (নিশ্চয়ই আমরা) শব্দটি বহুবচন (সম্মানসূচক) এবং যাকে নাযিল করা হয়েছে (কুরআন) তার জন্য একবচন বা 'হা' সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে। আপনি যদি কুরআন পড়েন, তবে দেখতে পাবেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যখনই কোনো কাজের কথা বলেন, তখন তিনি বহুবচন বা মহত্ত্বসূচক সর্বনাম ব্যবহার করেন। কারণ যেকোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্য আল্লাহর একাধিক গুণের (যেমন প্রজ্ঞা, রহমত, শক্তি, জ্ঞান ইত্যাদির) সমন্বিত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কিন্তু আল্লাহ যখন নিজের সত্তা বা অস্তিত্বের কথা বলেন, তখন সবসময় একবচন ব্যবহার করেন। আল্লাহ কখনোই বলেননি "আমরাই আল্লাহ", বরং বলেছেন: (اني أنا الله - নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ)। এই ক্ষেত্রে তিনি নিজের একত্ববাদের কথা বলেন, যেখানে তাঁর কোনো শরিক নেই। কিন্তু যখন কোনো ঘটনার কথা বলা হয় যা অনেকগুলো গুণের দাবি রাখে, তখন তিনি বহুবচনের রূপ ব্যবহার করেন, যেমন—"ইন্না আনযালনাহু"।

সুতরাং নাযিলকারী হলেন আল্লাহ, নাযিলকৃত বস্তু হলো কুরআন এবং যে সময়ে নাযিল হয়েছে তা হলো লাইলাতুল কদর। আল্লাহ যখন কোনো সময়কে বিশেষ মর্যাদার জন্য বেছে নেন—যেহেতু তিনি স্রষ্টা এবং তিনি যা চান তা-ই বেছে নেন; তিনি ফেরেশতাদের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন, মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন, ভূমির মধ্য থেকে বিশেষ স্থান (যেমন মক্কা) বেছে নেন এবং সময়ের মধ্য থেকে বিশেষ সময় বেছে নেন। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে তিনিই ভালো জানেন।

এই নির্বাচন কিন্তু সময়ের নিজস্ব কোনো গুণের কারণে নয়, বরং সেই সময়ে যে ঘটনাটি ঘটেছে তার কারণেই সময়টি অনন্য মর্যাদা পেয়েছে। আল্লাহ যখন কোনো সময়, স্থান, মানুষ বা ফেরেশতাকে বেছে নেন, তার উদ্দেশ্য একটাই—যেন সেই নির্বাচনের বরকত ও আলো সবকিছুর মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। এটি সময়ের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব নয়, স্থানের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব নয়, মানুষের প্রতি কিংবা ফেরেশতাদের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব নয়।

কারণ এই বিশেষ মর্যাদা বা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে কেবল সেই মহান ঘটনার কারণে যা সেখানে ঘটেছে। আর আমরা চাই এই ঘটনার আলো যেন পুরো মানবজাতির মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেছে নিয়েছেন, তখন তিনি চেয়েছেন তাঁর এই নির্বাচনের মাধ্যমে পুরো মানবজাতি উপকৃত হোক।

যখন তিনি ফেরেশতাদেরকে বেছে নেন, তখন তিনি চান তাদের আলো সব স্থানে পৌঁছাক। যখন তিনি একটি রাতকে বেছে নেন, তখন তিনি চান তার বরকত সব সময়ে ছড়িয়ে পড়ুক। তাই আল্লাহর সমস্ত নির্বাচন—তা সময় হোক বা স্থান—তার মূল উদ্দেশ্যই হলো সেই কল্যাণের আলো যেন প্রতিটি সময়ে, প্রতিটি স্থানে এবং প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

আল্লাহ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেছে নিলেন এবং অন্য সব রাসূলদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন, আর আমাদের নির্দেশ দিলেন আমরা যেন তাঁর জন্য 'মাকামে মাহমুদের' দোয়া করি—এটি তাঁর সম্মান আরও বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাস্তবে আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দোয়া করি, তখন আমরা নিজেদের জন্যই দোয়া করি। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কিয়ামাতের দিন মাকামে মাহমুদে স্থান পাবেন, তখন তাঁর প্রথম কাজই হবে আমাদের জন্য শাফায়াত বা সুপারিশ করা। তাই আমি যখন আল্লাহর রাসূলের জন্য দোয়া করছি, প্রকারান্তরে আমি নিজের কল্যাণের জন্যই দোয়া করছি।

আমরা আবার লাইলাতুল কদরের কথায় ফিরে আসি। যেহেতু এই রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে এবং কুরআন মানবজাতির জন্য আল্লাহর হেদায়াত বহন করে, তাই এই রাতটি পরম উদযাপনের ও সম্মানের দাবি রাখে। মানুষ যখন কোনো সময়কে সম্মান করে, তখন সে আসলে সেই সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাটিকেই সম্মান করে। সময় নিজে কিন্তু মূল লক্ষ্য নয়, বরং সময়ে যা ঘটেছে সেটাই মূল বিবেচ্য বিষয়।

মানুষ যখন লাইলাতুল কদরের রাতকে ইবাদতের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখে (শবে কদর পালন করে), তখন সে তা করে কেবল এই কারণে যে আল্লাহ এই রাতকে সম্মানিত করেছেন; কারণ এটি ছিল কুরআনের জন্ম বা নাযিলের রাত। তাই এই রাতের সম্মান মানেই হলো কুরআনের সম্মান। মানুষ কোনো সময়ের ঘটনাকে তখনই সম্মান করে যখন সে সেই ঘটনার সুফল ও প্রভাবে আনন্দিত হয়। সুতরাং আল্লাহর বাণী "আমি এটি লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি"—এর অর্থ হলো কুরআনকে লাওহে মাহফুজ থেকে বের করে দুনিয়ায় তার পথপ্রদর্শনের আলো হিসেবে প্রকাশ করা।

তবে কি লাইলাতুল কদরের নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব বা মর্যাদা আগে থেকেই ছিল যার কারণে আল্লাহ কুরআন নাযিলের জন্য একে বেছে নিয়েছিলেন? হ্যাঁ, এটি সম্ভব। কারণ এটি হলো সৃষ্টির সমস্ত ঘটনা বা ভাগ্য নির্ধারণের আদি সময়। প্রতি বছর আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার আকাশে ভাগ্য বা তাকদির নাযিলের কাজ এই রাতেই সম্পন্ন হতো। যেহেতু এটি সমস্ত বিষয় নির্ধারণ বা تقدير (তাকদির)-এর সময় ছিল, তাই আল্লাহ মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা ও তাকদির অর্থাৎ কুরআন নাযিলের জন্য এই রাতটিকেই বেছে নেন।

তাহলে "লাইলাতুল কদর" নামটির উৎস কী? এর অর্থ হতে পারে যে, কুরআন নাযিল হওয়ার আগে থেকেই এই রাতটি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান (ذات قدر) ছিল, তাই আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে বড় মর্যাদা বা কুরআন নাযিলের জন্য একে বেছে নেন। অথবা এই রাতে কুরআন নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতাদের অবতরণের কারণেই এই রাতটি এই বিশাল মর্যাদা ও ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা লাভ করেছে: (تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر - এই রাতে ফেরেশতাগণ ও রুহ (জিবরাঈল) তাদের রবের নির্দেশে সমস্ত বিষয় নিয়ে অবতীর্ণ হন)।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে, লাইলাতুল কদর প্রাচীনকাল থেকেই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও বান্দাদের প্রতি নেয়ামত বর্ষণের সময় হতে পারে, যা পরবর্তীতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর সর্বশেষ ও সবচেয়ে বড় আলোর জ্যোতি—কুরআন নাযিলের সময় হিসেবে

নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং লাইলাতুল কদর শব্দের অর্থ "শরাফত" বা পরম সম্মানও হতে পারে, আবার "তাকদির" বা ভাগ্য নির্ধারণও হতে পারে। যদি এর অর্থ সম্মান ধরা হয়, তবে তা কুরআনের উসিলায় অর্জিত হয়েছে। আর যদি এর অর্থ ভাগ্য নির্ধারণ ধরা হয়, তবে তা সৃষ্টির ভাগ্য নির্ধারণের সময় হিসেবেও সঠিক, আর আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্যের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ভাগ্য হলো কুরআন নাযিল হওয়া।

লাইলাতুল কদর মূলত দুটি দিক থেকেই তার মহিমান্বিত মর্যাদা পেয়েছে: ভাগ্য নির্ধারণ (তাকদির) এবং পরম সম্মান (কদর)। এরপর আল্লাহ এই রাতের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়ে বলেন: (وما أدراك ما ليلة القدر - আর কদরের রাত কী, তা তোমাকে কিসে জানাবে?)। এখানে "আদরাকা" শব্দটি অতীতকালের রূপ। এর অর্থ হলো—পূর্বে কেউই তোমাকে লাইলাতুল কদরের আসল মর্যাদা সম্পর্কে জানাতে পারেনি। যেহেতু আল্লাহ নিজেই তাঁর নবীকে পূর্বে এর হাকিকত জানানো থেকে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, তার মানে এই রাতের প্রকৃত ও পূর্ণ মর্যাদা আল্লাহ ছাড়া আর কেউই পুরোপুরি জানে না। তাই আপনি যদি এর মর্যাদা জানতে চান, তবে আল্লাহ এর সম্পর্কে কী বলছেন তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

কেন এক হাজার মাস?

কুরআন যখন "আদরাকা" (অতীতকাল) অথবা "ইউদরিকা" (বর্তমান/ভবিষ্যৎকাল) শব্দ ব্যবহার করে, তখন আমাদের একটি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। "মা আদরাকা" (অতীতকাল) মানে হলো—এর আগে কেউই তোমাকে এই বিষয়ে জানায়নি বা তুমি জানতে না, কিন্তু আল্লাহ এখন তোমাকে তা জানাবেন ও শেখাবেন। আর এখানে আল্লাহ তাকে জানিয়ে দিলেন এবং বললেন—"লাইলাতুল কদর হলো এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।" সুতরাং কুরআনে যখনই আপনি "মা আদরাকা" শব্দবন্ধটি পাবেন, জানবেন যে আল্লাহ এর পরপরই তার উত্তর দিয়ে বিষয়টি জানিয়ে দেবেন। আর যখন আপনি "মা ইউদরিকা" (বর্তমানকাল) পাবেন, তখন জানবেন যে এটি অদৃশ্যের এমন এক গোপন বিষয় যা আল্লাহ ভবিষ্যতেও কাউকে জানাবেন না (যেমন কিয়ামতের সুনির্দিষ্ট সময়)।

পবিত্র কুরআনে (وما أدراك ما ليلة القدر) এর মতো বাক্য কেবল তখনই ব্যবহার করা হয়, যখন কোনো বিষয়ের মর্যাদা এত বিশাল ও মহান হয় যা মানুষ তার নিজের বুদ্ধি, চেষ্টা বা জ্ঞান দিয়ে পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারে না; কেবল আল্লাহই তা জানেন। এটি মূলত লাইলাতুল কদরের প্রতি এক বিরাট সম্মান প্রদর্শন। এই রাতের কল্যাণ মানুষের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি, যা কেবল তিনিই ভালো জানেন যিনি একে সর্বোত্তম বাণী নাযিলের জন্য বেছে নিয়েছেন।

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন: (ليلة القدر خير من الف شهر - লাইলাতুল কদর এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম)। মাত্র একটি রাতকে হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করার এই বিষয়ের সামনে আমাদের একটু থমকে দাঁড়াতে হবে। যেহেতু এক বছরে ১২টি মাস থাকে, তাই এক হাজার মাস মানে হলো প্রায় ৮৩ বছর—অর্থাৎ প্রায় আশিটি লাইলাতুল কদরের সমান সময়। তাহলে কি এই একটি মাত্র লাইলাতুল কদর আগামী আশিটি লাইলাতুল কদরের চেয়েও উত্তম? আর কেনই বা সুনির্দিষ্টভাবে "এক হাজার" সংখ্যাটি বেছে নেওয়া হলো?

এর কারণ হলো—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তৎকালীন আরবদেরকে তাদের বুদ্ধিমত্তা ও ভাষারীতি অনুযায়ী সম্বোধন করছিলেন। আরবরা সেই সময়ে মনে করত যে "এক হাজার" (আলফ) হলো গণনার শেষ বা সর্বোচ্চ সংখ্যা। তাই তারা যখন এক হাজারেরও বেশি কোনো সংখ্যার কথা বলতে চাইত, তখন তারা সংখ্যাটি পুনরুক্তি করে বলত "এত হাজার"। তারা তখন মিলিয়ন বা বিলিয়নের মতো শব্দ জানত না। সুতরাং এক হাজার ছিল তাদের গণনার সর্বোচ্চ চূড়া। আল্লাহ যেন তাদের বলতে চাইলেন: "লাইলাতুল কদর হলো এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম", অর্থাৎ তোমরা গণনার স্কেলে যে সর্বোচ্চ সংখ্যাটি চেনো, এই রাত তার চেয়েও কোটি গুণ শ্রেয়। এর আসল অর্থ হলো—লাইলাতুল কদর পুরো সময়ের চেয়েও উত্তম, তা যত দীর্ঘই হোক না কেন।

কিন্তু এই রাতটি এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম কোন দিক থেকে? এটি মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতের জন্য এক বিরাট সুসংবাদ। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) পূর্ববর্তী উম্মতের এক ব্যক্তির কথা শুনলেন যিনি আল্লাহর রাস্তায় এক হাজার মাস (বা এক হাজার বছর) ধরে তরবারি হাতে জিহাদ করেছিলেন। তা শুনে নবীজী তাঁর নিজের উম্মতের আয়ুষ্কালকে অনেক কম ও সংক্ষিপ্ত মনে করলেন এবং ভাবলেন যে তাঁর উম্মত হয়তো পূর্বের উম্মতদের মতো এত বিপুল আমল করার সুযোগ পাবে না। তখন আল্লাহ যেন তাঁর নবীকে সান্ত্বনা ও আনন্দ দিতে চাইলেন এবং বললেন: আপনার উম্মতের জন্য এমন একটি রাত রয়েছে, তারা যদি এই রাতে সুন্দরভাবে আল্লাহর দরবারে ইবাদত ও ইখলাসের সাথে দাঁড়ায়, তবে তা তাদের জন্য এক হাজার মাসের জিহাদের চেয়েও বেশি ও যথেষ্ট হয়ে যাবে। এর অর্থ হলো—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতকে এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের বিনিময়ে এমন এক নেয়ামত দিলেন, যা অন্য উম্মতরা দীর্ঘ সময় ব্যয় করেও অর্জন করতে পারত না।

তবে আল্লাহ তায়ালা লাইলাতুল কদর সম্পর্কে আমাদের আরও একটি গভীর সত্য জানাতে চেয়েছেন; আর তা হলো—এই রাতটি পৃথিবীতে আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাদের অবতরণের এক বিশেষ সময়। পৃথিবীতে আল্লাহর রহমত ও বিধানের এই অবতরণ ঘটে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম বা 'নামুস'-এর অধীনে। আর মানুষের

বুদ্ধিও এটি অস্বীকার করে না যে, প্রতিটি নিয়মের পেছনে বা মহাবিশ্বের প্রতিটি আইনের পেছনে আল্লাহর কোনো না কোনো ফেরেশতা নিয়োজিত থাকতে পারেন। ফেরেশতারা হলেন আল্লাহর অদৃশ্যের এক সৃষ্টি। মহাবিশ্বের প্রতিটি নিয়ম—যেমন মানুষের রিজিক, রহমত, কিংবা মৃত্যু—সবকিছুর জন্যই ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। যার প্রমাণ আল্লাহর বাণী: (فالمدبرات أمرا - অতঃপর যারা সমস্ত বিষয় বা কাজ পরিচালনা করে)। অর্থাৎ আল্লাহ অদৃশ্য ফেরেশতাদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা মানুষের বাস্তব জীবনে নির্দিষ্ট কিছু অদৃশ্য দায়িত্ব ও কাজ তদারকি ও পরিচালনা করতে পারেন।

লাইলাতুল কদরকে কুরআন নাযিলের জন্য সুনির্দিষ্ট করার কারণ হতে পারে যে, আল্লাহ প্রাচীনকাল থেকেই এই রাতটিকে পৃথিবীতে তাঁর বিশেষ রহমত ও ফায়সালা অবতরণের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করে রেখেছেন; যেখানে বছরের সমস্ত বিধান ও তাকদির ফেরেশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং তারা সারা বছর ধরে তা বাস্তবায়ন করেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা বলেন: (سلام هي حتى مطلع الفجر - ঊষালগ্ন বা ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত এই রাতটি সম্পূর্ণ শান্তিময়)।

লাইলাতুল কদরে যে কেবল কুরআন নাযিল হয়নি, বরং অন্যান্য বিষয়ও নাযিল হয়েছে, তার প্রমাণ হলো আল্লাহর বাণী: (تنزل الملائكة والروح فيها - এই রাতে ফেরেশতাগণ ও রুহ অবতীর্ণ হন)। এখানে 'রুহুল আমীন' অর্থাৎ জিবরাঈল (আ.) এসেছিলেন কুরআন নিয়ে, আর বাকি ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়েছিলেন দুনিয়ায় আল্লাহর কল্যাণ, বরকত ও ফায়সালা নিয়ে। অর্থাৎ ফেরেশতারা কুরআন ছাড়াও অন্যান্য মহৎ উদ্দেশ্যে অবতরণ করেন, যাতে প্রতিটি ফেরেশতা আল্লাহ প্রদত্ত নিজ নিজ দায়িত্ব মানুষের মাঝে ও মহাবিশ্বে পালন করতে পারেন।

এরপর আল্লাহ বলেছেন: (سلام هي حتى مطلع الفجر); এর অর্থ হলো এই পবিত্র রাতে কল্যাণ এবং শান্তি ছাড়া আর কিছুই নাযিল হয় না। কারণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নিয়মের মধ্যে যে কল্যাণ নাযিল হয়, তা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য পরম উপকারী ও কল্যাণকর। এটি তো গেল জীবনের জাগতিক বা বস্তুগত দিকের কথা। আর

আধ্যাত্মিক বা আত্মিক দিকের কথা যদি বলি, তবে এই রাতে নাযিল হওয়া সবচেয়ে বড় কল্যাণটি হলো মহান কুরআন, যা পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবন পরিচালনা ও আচরণের জন্য সর্বশেষ ও সবচেয়ে নিখুঁত জীবনবিধান (منهج) তৈরি করে দিয়েছে।

বিষয়টি যেহেতু এমনই, তাই এই রাতে যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) আমরা যদি তাকে স্বাগত জানাই এবং আমাদের জীবনে চলার পথ বা সংবিধান বানিয়ে নিই, তবে পুরো মহাবিশ্ব শান্তি, রহমত ও বরকতে ভরে যাবে। সুতরাং লাইলাতুল কদরের এই শান্তি কেবল এক রাতের জন্য নয়, বরং তা সমস্ত যুগ ও শতাব্দীর জন্য প্রযোজ্য এক চিরন্তন শান্তি। এই শান্তি কখনোই নষ্ট হবে না। শান্তি লাইলাতুল কদরেই নাযিল হয়ে গেছে, কিন্তু এখন এটি বাস্তবায়ন করা বা না করার পুরো দায়িত্ব আমাদের নিজেদের ওপর। আমরা যদি তা জীবনে বাস্তবায়ন করি, তবে লাইলাতুল কদরের শান্তি আমাদের পুরো জীবন ও সময়কে আমূল বদলে দেবে। আর আমরা যদি তা অকেজো করে রাখি এবং এর নির্দেশ না মানি, তবে শান্তি তো লাইলাতুল কদরেই নাযিল হয়েছিল, কিন্তু আমরা নিজেরাই সেই শান্তির সুফল গ্রহণ করা থেকে বিরত রইলাম।

আমাদের উচিত লাইলাতুল কদরের পুরো রাতটি আল্লাহর দরবারে খাঁটি দাসত্ব ও বিনীত প্রার্থনার মাধ্যমে অতিবাহিত করা। আমরা যদি এই রাতটি আল্লাহর হক আদায় করে ইবাদত করতে পারি, তবে তার মানে দাঁড়াবে—আমরা আমাদের প্রিয়তম নেয়ামত অর্থাৎ আল-কুরআনের নাযিল হওয়ার সেই পবিত্র সময় ও স্মৃতিকেই আবার নতুন করে বাঁচিয়ে তুললাম; যে কুরআন আমাদের শিখিয়েছে আল্লাহর প্রতি নিখাদ দাসত্ব এবং মুক্তির সঠিক পথ।

তাই লাইলাতুল কদর উদযাপন করার অর্থ হলো—এই রাত এবং এই রাতে যা নাযিল হয়েছে তার জন্য আল্লাহর প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। মানুষ কোনো ঘটনার জন্য তখনই আনন্দিত হতে পারে, যখন সেই ঘটনার সুফল ও প্রভাব তার নিজের আত্মার মাঝে বিশুদ্ধতা ও নম্রতা এনে দেয় এবং তার আচরণে বিনয় প্রকাশ পায়। আর তখনই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর পরম করুণায় বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বলেন: "যেহেতু আমার বান্দা আমার দেওয়া জীবনবিধানের

(কুরআনের) আগমনে এত আনন্দিত হয়েছে যে সে এর শুরুর রাতটিকে সম্মান করছে, তাই আমার কাছে তার জন্য ক্ষমা ছাড়া আর কোনো প্রতিদান নেই।"

রমজান মাসে রাতটি সুনির্দিষ্ট করা

এরপর আমরা আসি রমজান মাসের সেই অনন্য ও একক রাতটিকে খুঁজে বের করার বিষয়ে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এক আয়াতে বলেছেন: (انا أنزلنا في ليلة القدر - নিশ্চয়ই আমি এটি লাইলাতুল কদরে নাযিল করেছি) অর্থাৎ কুরআন লাইলাতুল কদরে নাযিল হয়েছে। আবার অন্য আয়াতে বলেছেন: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن - রমজান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে)। কুরআন তো বিভিন্ন সময়ে ও মাসেও নাযিল হয়েছে (ধাপে ধাপে), কিন্তু কুরআন নাযিলের আনুষ্ঠানিক সূচনা অথবা মহাবিশ্বে তার দায়িত্ব পালনের মূল অনুমতিটি দেওয়া হয়েছিল রমজান মাসে এবং লাইলাতুল কদরের রাতে।

তবে লাইলাতুল কদর সময়ের চক্রে আবর্তিত ও গতিশীল একটি রাত; এর অর্থ হলো এটি যুগের পর যুগ ধরে বছরের প্রতিটি দিনের ওপর দিয়েই ঘুরে ঘুরে এসেছে। চন্দ্র বছর ও সৌর বছরের মধ্যে প্রায় ১১ দিনের যে পার্থক্য রয়েছে, সেই পার্থক্যের কারণে রমজান মাস কখনো শীতে, কখনো গরমে, কখনো শরতে আবার কখনো বসন্তে আসে। অর্থাৎ এটি বছরের সব ঋতু ও সব দিনের মাঝেই আবর্তিত হয়। আমরা যদি দীর্ঘ সময়ের এই হিসাবটি দেখি, তবে দেখব যে সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত লাইলাতুল কদরের রাতটি বছরের প্রতিটি সৌর দিনের ওপর দিয়ে অন্তত একবার হলেও অতিবাহিত হয়েছে। লাইলাতুল কদর পুরো পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়ায় যাতে তা সব সময় ও কালকে নিজের মাঝে ধারণ করতে পারে।

আমাদের ইবাদতের জন্য এটি রমজান মাসে নির্দিষ্ট হলেও, সামগ্রিক সময়ের হিসাবে এটি বছরের যেকোনো দিনেই ঘুরতে পারে। হাদীসের যে বর্ণনায় বলা হয়েছে "তোমরা এটিকে রমজানের শেষ দশকে খোঁজো" অথবা "শেষ দশকের বিজোড় রাতে খোঁজো"—সেখানে যদি বিশ তারিখের পর সুনির্দিষ্ট কোনো একটি রাতের কথা বলা হতো, তবে হয়তো কোনো দ্বিমত থাকত না। কিন্তু রমজানের শেষ দশকের মাসটি কখনো ৩০ দিনের হতে পারে, আবার কখনো ২৯ দিনেরও হতে পারে।

যখন রমজান মাস ২৯ দিনের হয় এবং আমরা শেষ দশকে লাইলাতুল কদর তালাশ করি, তখন দিন গণনার হিসাবটি মূলত ২০ তারিখের রাত থেকেই শুরু হয়ে যায়। ফলে (শেষ দিক থেকে হিসাব করলে) বিজোড় রাতগুলো দাঁড়ায়—২০, ২২, ২৪ তারিখ ইত্যাদি। আর যদি রমজান মাস ৩০ দিনের হয়, তবে শুরুর হিসাবটি হয় ২১ তারিখের রাত থেকে, এবং তখন বিজোড় রাতগুলো হয়—২১, ২৩, ২৫ তারিখ ইত্যাদি।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জাগে: আমরা যখন রমজানের ২০ তারিখে পদার্পণ করি, তখন আমাদের মধ্যে কে জানে যে এই বছরের রমজান মাসটি ২৯ দিনের হবে নাকি ৩০ দিনের হবে? অবশ্যই আমরা আগে থেকে তা জানতে পারি না এবং অদৃশ্যের খবরও আমাদের কাছে নেই। এই কারণেই আমরা যদি রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর পেতে চাই, তবে আমাদের উচিত শেষ দশকের প্রতিটি রাতেই একে তালাশ করা, অথবা শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে সচেতন থাকা। কারণ আমরা জানি যে রমজান মাসের সমাপ্তি ২৯ নাকি ৩০ দিন হবে—তার ওপর ভিত্তি করে জোড় রাত বিজোড় হতে পারে আর বিজোড় রাত জোড় হতে পারে। তাই ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে কোনো দ্বিমত ছাড়াই এটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যে—আমাদের উচিত রমজানের শেষ দশকের পুরোটা জুড়েই এই মহিমান্বিত রাতটি অনুসন্ধান করা।

এবার আমরা আরেকটি পয়েন্টে আসি, সেটা হলো- সুনির্দিষ্টভাবে ২১, ২৩, ২৫ কিংবা ২৭ তারিখের রাতের জন্য অপেক্ষা করা। এই যে রাতটিকে গোপন রাখা বা এর স্থানান্তর হওয়া—এটি মূলত মানুষের কোনো কোনো আচরণে ক্ষতিকর প্রভাব বা অকল্যাণের বহিঃপ্রকাশেরই একটি ফল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ঘর থেকে বের হয়ে সাহাবীদের বললেন: "আমি তোমাদের লাইলাতুল কদরের সুনির্দিষ্ট তারিখটি জানিয়ে দেওয়ার জন্যই বের হয়েছিলাম। কিন্তু পথিমধ্যে অমুক ও অমুক ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদে লিপ্ত হলো, আর তখনই আমার মন থেকে সেই সুনির্দিষ্ট জ্ঞানটি উঠিয়ে নেওয়া হলো (অর্থাৎ তা গোপন করে দেওয়া হলো)। অতএব, তোমরা এখন এটিকে শেষ দশকে তালাশ করো।"

যে জ্ঞানটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে লাইলাতুল কদরের সুনির্দিষ্ট সময়টি জানাতে এসেছিল, মসজিদের ভেতর দুজন মুসলিমের মধ্যকার

পারস্পরিক ঝগড়া ও শত্রুতামূলক আচরণের কারণে সে বরকতময় জ্ঞানটি উম্মাতের কাছ থেকে আড়াল করে দেওয়া হলো। এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের এই শিক্ষা দিতে চান যে—ঝগড়া, বিবাদ ও পারস্পরিক কলহ হলো শয়তানের প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র, যা মানুষের ওপর আল্লাহর রহমত ও বরকতের আগমনকে বাধাগ্রস্ত করে। কারণ মনের পবিত্রতা ও পারস্পরিক হৃদ্যতাই আল্লাহর রহমতকে আকর্ষণ করে।

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর বান্দাদের এমন এক মজলিস বা সমাজে দেখেন যেখানে কোনো হিংসা-বিদ্বেষ নেই, সবাই পবিত্র ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ, ঠিক তখনই সেখানে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা বরকত নিয়ে অবতীর্ণ হন। কেন? কারণ- আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও পবিত্রতা পছন্দ করেন। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন: (والذين اهتدوا زادهم هدى - আর যারা সৎপথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের হেদায়াত আরও বাড়িয়ে দেন)।

কিন্তু আল্লাহ যখন মানুষের ওপর এক বিশাল কল্যাণ ও রহমত বর্ষণ করতে চান, আর পরে দেখেন যে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি ও বিবাদে লিপ্ত এবং কলুষিত হৃদয়ের কারণে তারা আল্লাহর এই বিশেষ রহমত গ্রহণের অনুপযুক্ত, আর তাদের ঈমানী চেতনা ও গ্রহণের যন্ত্রটি বিকল হয়ে পড়েছে, তখনই আল্লাহ সেই বিশেষ কল্যাণটি সাময়িকভাবে তুলে নেন বা গোপন করে দেন।

তাই আমরা যদি আল্লাহর স্থায়ী অনুগ্রহ ও নেয়ামতের যোগ্য হতে চাই, তবে আমাদের সর্বদা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া ও পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে, যাতে আমরা আল্লাহর রহমতকে বুকে ধারণ করতে পারি। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর অসীম করুণায় অন্য কারো ভুলের কারণে আমাদের পুরো কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করতে চাইলেন না; বরং আমাদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে কিছুটা পরিশ্রম করাতে চাইলেন। তাই তিনি একটি সুনির্দিষ্ট রাতের বদলে এটিকে রমজানের শেষ দশকের মাঝে গোপন রেখে আমাদের আমলের পরিধি বাড়িয়ে দিলেন। এর পেছনে আল্লাহর এক গভীর প্রজ্ঞা রয়েছে—তিনি চান মানুষ যেন যেকোনো মূল্যে সমাজে শান্তি বজায় রাখে এবং সব

ধরণের অন্যায় ও বিবাদের মুখোমুখি হয়ে পবিত্র চিত্তে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ লাভ করার জন্য সচেষ্ট হয়।

এই অবস্থায়, কল্যাণের পথে অবিচল থাকা এবং সব ধরণের বিবাদ থেকে দূরে থাকাই হলো একজন মানুষের নিজের এবং তার সমাজের জন্য সবচেয়ে বড় সুরক্ষা। যেমন- মহান আল্লাহর বাণী:

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة

অর্থাৎ, আর তোমরা এমন ফিতনা বা বিপর্যয় থেকে সতর্ক থাকো, যা বিশেষ করে কেবল তোমাদের মধ্যকার জালেমদের ওপরই আপতিত হবে না। বরং, সমাজ কলুষিত হলে তার কুফল সবাইকেই ভোগ করতে হবে। (সূরা আনফাল- ২৫)

লেখক পরিচিতি

শায়েখ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লি আল-শারাউয়ী বক্ষমান চ্যালেঞ্জ অফ দ্য হলি কুরআন বইটির লেখক।এর পাশাপাশি তিনি আরও ৩৩৩ টি বই রচনা করেছেন।

শায়েখ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লি আল-শারাউয়ী (১৩২৯ - ১৪১৯ হিজরি) ছিলেন মিসরের একজন প্রখ্যাত ইসলামী পণ্ডিত এবং সাবেক ওয়াকফ মন্ত্রী। আধুনিক যুগে পবিত্র কুরআনের তাফসীরকারক তথা মুফাসসিরদের মধ্যে তিনি অন্যতম জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় পবিত্র কুরআনের তাফসির বা ব্যাখ্যা করতেন, যার ফলে সমগ্র আরব বিশ্বের সাধারণ মুসলিমদের একটি বিশাল অংশের কাছে তিনি খুব দ্রুত পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন। অনন্য প্রচারশৈলীর কারণে অনেকেই তাঁকে 'ইমামুদ দুআহ' (দ্বীন প্রচারকদের ইমাম) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

জন্ম ও শিক্ষাজীবন:

শায়েখ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লি আল-শারাউয়ী ১৯১১ সালের ১৫ এপ্রিল মিসরের দাকাহলিয়া জেলার দাকাদূস গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১১ বছর বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন। ১৯২২ সালে তিনি যাকাযিকের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত ইবতেদায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। শৈশব থেকেই কবিতা মুখস্থ করা, প্রবাদ-প্রবচন ও মনিষীদের বাণী স্মরণে রাখার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অসাধারণ মেধার স্বাক্ষর রাখেন। ১৯২৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে তিনি আজহার ইনস্টিটিউটের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেন। সেখানে কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ আরও বেড়ে যায় এবং সহপাঠীদের মাঝে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার স্থান লাভ করেন। ছাত্ররা তাঁকে ছাত্র সংসদের ভিপি (সভাপতি) এবং যাকাযিক সাহিত্য সমিতির সভাপতি নির্বাচিত করেন। সেই সময় তাঁর সাথে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন ড. মোহাম্মদ আবদুল মোনেম খাফাজি, কবি তাহের আবু ফাশা, অধ্যাপক খালেদ

মোহাম্মদ খালেদ, ড. আহমেদ হাইকাল এবং ড. হাসান জাদ যুক্ত ছিলেন, যারা নিজেদের লেখা কবিতা বা সাহিত্য শারাউয়ীকে দেখাতেন ও তাঁর মতামত নিতেন।

শায়েখ শারাউয়ী-এর জীবনে এক বড় পরিবর্তন আসে যখন তাঁর বাবা তাঁকে উচ্চ শিক্ষার জন্য কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইলেন। কিন্তু শেখ শারাউয়ী চাইলেন গ্রামে ভাইদের সাথে থেকে চাষবাস করতে। তবে বাবার জেদের কারণে অবশেষে তাঁকে কায়রোতেই আসতে হয়। বাবা তাঁর পড়াশোনার খরচ ও থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দেন।

বাবার এই ইচ্ছার বিপরীতে শেখ শারাউয়ী তখন একটি কৌশল খাটালেন। তিনি বাবার সামনে শর্ত রাখলেন যে, তাঁকে আরবী ভাষা, সাহিত্য, কুরআনের গভীর জ্ঞান, তাফসির এবং হাদীসের মূল ও প্রাচীন বইগুলোর (উম্মাহাতুল কুতুব) এক বিশাল সংগ্রহ কিনে দিতে হবে। তাঁর ধারণা ছিল এত বড় খরচের কথা শুনে বাবা হয়তো পিছিয়ে যাবেন এবং তাঁকে গ্রামে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। কিন্তু তাঁর বাবা ছেলের এই চালাকি ধরে ফেলেন এবং তাঁর চাওয়া সব বই কিনে দিয়ে বলেন, "বাবা, আমি জানি এই বইগুলোর সবগুলো তোমার সিলেবাসের বই নয়, কিন্তু আমি এগুলো তোমাকে কিনে দিলাম যাতে তুমি জ্ঞানের এই বিশাল সমুদ্র থেকে মন ভরে জ্ঞান আহরণ করতে পারো।" সাংবাদিক তারেক হাবিবের সাথে এক সাক্ষাৎকারে শেখ শারাউয়ী নিজেই এই স্মৃতিচারণ করেছিলেন।

১৯৩৭ সালে শারাউয়ী আরবী ভাষা অনুষদে ভর্তি হন এবং জাতীয় আন্দোলন ও আজহারী ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল আল-আজহার। মিসরীয়দের ক্ষোভ ও প্রতিবাদের ইশতেহারগুলো এই আজহার থেকেই প্রকাশিত হতো। যাকাযিকস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কায়রোর আজহার দুর্গের চেয়ে খুব একটা দূরে ছিল না, তাই তিনি ও তাঁর সহপাঠীরা আল আজহার প্রাঙ্গণে চলে আসতেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে গরম গরম বক্তৃতা দিতেন। রাজনৈতিক ও ছাত্র আন্দোলনের কারণে তিনি ১৯৩৪ সালে ছাত্র সংসদের সভাপতি থাকাকালীন সময়ে বেশ কয়েকবার গ্রেপ্তারও হন।

পারিবারিক জীবন:

মাধ্যমিকে পড়ার সময়ই বাবার পছন্দে শায়েখ শারাউয়ী বিয়ে করেন। বাবার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে তিনি বিয়েতে রাজি হন। তাঁদের সংসারে তিন ছেলে ও দুই মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। ছেলেরা হলেন—সামী, আবদুর রহিম ও আহমেদ; আর মেয়েরা হলেন—ফাতিমা ও সালিহা। শেখ শারাউয়ী বিশ্বাস করতেন যে, একটি সফল দাম্পত্য জীবনের প্রথম শর্ত হলো পারস্পরিক পছন্দ, সম্মতি ও ভালোবাসা।

কর্মজীবন:

তিনি ১৯৪০ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং ১৯৪৩ সালে শিক্ষকতার অনুমতিসহ উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি প্রথমে তানতাস্থ ধর্মীয় ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এরপর একে একে যাকাযিক ও আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মীয় ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা করেন। দীর্ঘ কর্ম-অভিজ্ঞতার পর, ১৯৫০ সালে তিনি সৌদি আরবে পাড়ি জমান এবং উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়াহ বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

মূলত আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে তাঁকে 'আকাইদ' (ইসলামী বিশ্বাস/দর্শন) বিষয়ে পড়াতে হয়েছিল। নিজের মূল বিষয়ের বাইরে গিয়ে এমন একটি কঠিন বিষয়ে পড়ানো বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল, কিন্তু শেখ শারাউয়ী তাঁর অসাধারণ মেধা দিয়ে এই বিষয়েও নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন, যা সবার কাছে দারুণ প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়।

১৯৬৩ সালে মিসরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসের এবং সৌদির রাজা সৌদের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ তৈরি হয়। এর ফলে প্রেসিডেন্ট আবদুন নাসের শেখ শারাউয়ীকে পুনরায় সৌদি আরবে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এরপর কায়রোতে আল-আজহারের প্রধান তথা শায়খুল আজহার হাসান মামুনের কার্যালয়ের পরিচালক হিসেবে তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি আল-আজহারের

প্রতিনিধি দলের প্রধান হয়ে আলজেরিয়া সফরে যান এবং সেখানে প্রায় সাত বছর শিক্ষকতা করেন। আলজেরিয়াতে থাকাকালীন ১৯৬৭ সালের জুন মাসে আরবে এক সামরিক বিপর্যয় ঘটে। মিসরের এই চরম সামরিক পরাজয়ের পর শায়েখ শারাউয়ী আল্লাহর দরবারে সেজদায়ে শোকর (কৃতজ্ঞতার সেজদা) আদায় করেছিলেন। পরবর্তীতে 'মিনাল আলিফ ইলাল ইয়া' (এ টু জেড) নামক টিভি অনুষ্ঠানে এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, "মিসর তখন সমাজতন্ত্রের (কমিউনিজম) কোলে চড়ে যুদ্ধ করছিল, তাই সমাজতন্ত্রের ছায়াতলে থেকে মিসর যদি জয়ী হতো, তবে মিসরীয়রা হয়তো তাদের আসল দ্বীন বা ধর্ম বিশ্বাস হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত (তাই পরাজয়ের মাধ্যমে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসার সুযোগ পেয়েছে)।"

কায়রোতে ফিরে আসার পর তিনি কিছুদিন গারবিয়া প্রদেশের ওয়াকফ পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর যথাক্রমে দ্বীন প্রচার ও গবেষণা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি এবং আল-আজহারের ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি আবারও সৌদি আরবে ফিরে যান এবং কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

১৯৭৬ সালের নভেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মামদুহ সালেম যখন তাঁর মন্ত্রিসভা গঠন করেন, তখন তিনি শেখ শারাউয়ীকে ওয়াকফ এবং আল-আজহার বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। তিনি ১৯৭৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

মিসরের ইতিহাসে প্রথম ইসলামী ব্যাংক অর্থাৎ 'ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। যদিও এই ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার ছিল অর্থনীতি বা অর্থ মন্ত্রীর (তৎকালীন ড. হামিদ আল-সায়েহ), কিন্তু তিনি শেখ শারাউয়ীকে এই দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং জাতীয় সংসদও এতে অনুমোদন দেয়। ১৯৮৭ সালে তিনি সম্মানজনক আরবী ভাষা একাডেমির (মাজমাউল খালিদিন) সদস্য নির্বাচিত হন।

গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ:

- তানতা আজহারী ইনস্টিটিউটের শিক্ষক, পরবর্তীতে আলেকজান্দ্রিয়া ও যাকাযিক ইনস্টিটিউটে বদলি।
- ১৯৫০ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদের শিক্ষক।
- ১৯৬০ সালে তানতা আজহারী ইনস্টিটিউটের ডেপুটি ডিরেক্টর।
- ১৯৬১ সালে ওয়াকফ মন্ত্রণালয়ের ইসলামী দাওয়াহ বিভাগের পরিচালক।
- ১৯৬২ সালে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা অনুষদের পরিদর্শক।
- ১৯৬৪ সালে শায়খুল আজহার হাসান মামুনের প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক।
- ১৯৬৬ সালে আলজেরিয়ায় আল-আজহার প্রতিনিধি দলের প্রধান।
- ১৯৭০ সালে মক্কার কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ অনুষদের ভিজিটিং প্রফেসর।
- ১৯৭২ সালে কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা (পোস্ট গ্র্যাজুয়েট) বিভাগের প্রধান।
- ১৯৭৬ সালে মিসর প্রজাতন্ত্রের ওয়াকফ ও আল-আজহার বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ।
- ১৯৮০ সালে ইসলামী গবেষণা একাডেমির সদস্য।
- ১৯৮০ সালে মিসর প্রজাতন্ত্রের শুরা কাউন্সিলের (উচ্চকক্ষ) সদস্য।
- তাঁকে 'শায়খুল আজহার' (আল-আজহারের প্রধান ইমাম)-এর পদসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে পুরোপুরি দ্বীনের প্রচার ও দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত করেন।

পুরস্কার ও সম্মাননা:

- ১৯৭৬ সালের ১৫ এপ্রিল মাসে অবসরে যাওয়ার সময় (মন্ত্রী হওয়ার ঠিক আগে) ইমাম শারাউয়ীকে প্রথম শ্রেণীর 'অর্ডার অব মেরিট' সম্মাননা প্রদান করা হয়।
- ১৯৮৩ ও ১৯৮৮ সালে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর 'অর্ডার অব দ্য রিপাবলিক' এবং 'দাওয়াত দিবস'-এর বিশেষ সম্মাননা পদক দেওয়া হয়।

- মনসুরা ও মানুফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সাহিত্যে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' (ডি.লিট) ডিগ্রি দেওয়া হয়।
- মক্কার 'রাবেতাতুল আলাম আল-ইসলামী' (মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ) তাঁকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর বৈজ্ঞানিক অলৌকিকত্ব বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে এবং বিভিন্ন গবেষণাপত্র মূল্যায়নের জন্য বিচারক প্যানেল তৈরির দায়িত্ব দেয়।
- ১৯৮৯ সালে দাকাহলিয়া গভর্নরেট তাদের এই কৃতী সন্তানকে সম্মান জানাতে বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবের মূল ব্যক্তিত্ব (পারসোনালিটি অব দ্য ইয়ার) হিসেবে ঘোষণা করে এবং তাঁর জীবন, কর্ম ও আন্তর্জাতিক দাওয়াতী ভূমিকার ওপর বিশাল পুরস্কারের ঘোষণা দেয়।
- দুবাই আন্তর্জাতিক পবিত্র কুরআন পুরস্কার কর্তৃপক্ষ ১৪১৮ হিজরি (১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) তাদের প্রথম আসরে ইমাম শারাউয়ীকে 'ইসলামী ব্যক্তিত্ব' (ইসলামিক পারসোনালিটি অব দ্য ইয়ার) হিসেবে সম্মানিত করে।

মিশরের দল মত নির্বিশেষে সবাই তাকে সম্মান করতেন। শায়েখ ১৯৯৮ সালের ১৭ জুন ১৪১৯ হিজরীর ২২ সফর তারিখে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ডাকে সাড়া দিয়ে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানিয়ে নিন। আমীন।